গৌর-প্রিয়া
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

গৌর-প্রিয়া

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

বসু সাহিত্য সংসদ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয় বসু
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ
রথযাত্রা, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ পট
শ্রীগণেশ বসু

ছেপেছেন
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৫

দাম তিন টাকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
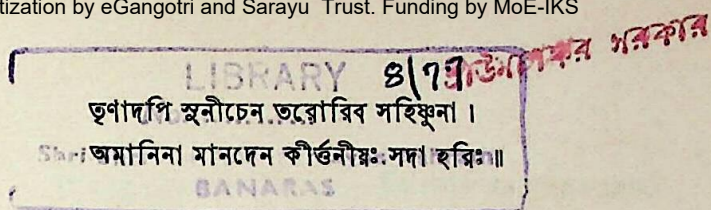
তৃণ থেকে সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও নিজে নিরভিমান হয়ে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক—সর্বদা হরিনাম কীর্তন করবে।

যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

'প্রিয়ে, তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবেনা। তোমাকে কাঁদাবার জন্যেই আমাকে গৃহত্যাগ করতে হবে।'

গৌরাঙ্গ-লীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একটি বিশেষ স্থান আছে। সে স্থানটির কথা সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব সচেতন নহি। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে চিরদিনই খানিকটা পটের আড়ালে রাখিয়াছেন, কিন্তু সেখান হইতে তিনি যে স্নিগ্ধমধুর কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন তাহাকে লক্ষ্য করিতে না পারিলে বিচিত্র মধুর গৌর-লীলাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করাই হইল না। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত গৌরাঙ্গের আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়ার এই স্নিগ্ধ মহিমাকে আমাদের নিকটে আভাসিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার মধ্যে লেখকের কোনো উগ্র-আত্মসচেতনতা নাই, আছে গভীর প্রত্যয় এবং বিনম্র প্রয়াস। বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মহিমাকে প্রকাশ করিবার জন্য ইহারই প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। তাঁহার এই চেষ্টায় বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নিগ্ধ মহিমায় জিজ্ঞাসু ভক্ত হৃদয়ে অনুকূল স্পর্শ লাগিলে সুখী হইব। শ্রীমৃণালকান্তি দাশ গুপ্তের এই সাধু চেষ্টাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

লেখকের কয়েকখানা বই—

॥ পরমারাধ্যা শ্রীমা ॥ মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ যুগ-বিপ্লবী-বিবেকানন্দ ॥ ॥ ভারতে নিবেদিতা ॥ রূপ হ'তে অরূপে ॥ দিনগুলি মোর ॥ ছোটদের রামকৃষ্ণ ॥ ছোটদের সাধক ॥ দেবী মাহাত্ম্য ॥

॥ গরীয়সী গৌরী ॥ (যন্ত্রস্থ)

—আমাদের প্রকাশিত বই—

শৈলজানন্দের
পটভূমিকা

উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
বেলকুড়ি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
রূপমতী

অশ্বিনী কুমার দত্তের
প্রেম
কর্ম যোগ

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের
শরৎ-সাহিত্য-সমীক্ষা

আমার বৈষ্ণব ভাই-বোনদের উদ্দেশে

গ্রন্থকার
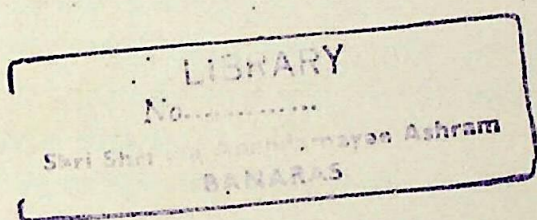
॥ প্রাক্ কথন ॥

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম। সৌভাগ্যকে প্রকাশ করবার জন্যেই কাঁদি। বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদেছেন। প্রকাশ করেছেন তাঁর সৌভাগ্য। কি সে সৌভাগ্য? ভালোবাসার সৌভাগ্য। প্রেমের সৌভাগ্য। গৌর-কথন শ্রবণ বর্ষণের সৌভাগ্য। তিনি বর্ষণও করেছেন, শ্রবণও করেছেন। তিনি নিজেও কেঁদেছেন, অপরকেও কাঁদিয়েছেন। জীবের আজন্মের কান্না, আজন্মের বিরহকে তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন।

গৌরসুন্দর মন্ত্র দিলেন প্রিয়ার কানে। কান্নার মন্ত্র। বললেন—'ওগো, তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবেন না। তোমাকে কাঁদাবার জন্যেই আমাকে গৃহত্যাগ করতে হবে।'

গৃহত্যাগ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। হলেন সন্ন্যাসী। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদলেন। জীব কাঁদল। অঝোর কান্না। গৌর-বিরহে গৌরময়ীর ক্রন্দন, কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার কান্না একই। ব্যাপক অর্থে এ হলো প্রেমময় রসময় সর্বকান্তি ভগবানরূপ কান্তর জন্য ভক্তরূপ কান্তার অনন্ত বিরহ-ক্রন্দন। যুগ যুগ ধরে এ কান্না চলে এসেছে। এ কান্নার বিরাম নেই। বিশ্রান্তি নেই। বিলয় নেই। কিন্তু বিস্তার আছে। বিলসন আছে। বিশ্রুতি আছে।

বৃন্দাবনপতি শ্যামসুন্দর হরণ করলেন গোপীচিত্ত। শ্রীমতী রাধিকা নিজেকে নিবেদন করলেন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ-চরণে। বললেন—আমার নিজের কোনও সুখসম্ভোগের স্পৃহা নেই। কামনা নেই। সুখ নেই। সন্তোষ নেই। কেবল চাই, তুমি সুখে থাকো। তুমি ভালো থাকো। তুমি আনন্দ লাভ করো। তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ।

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হলো রাধা-চিত্ত। বিভোর হলো তাঁর তনু, মন, প্রাণ। সমস্তই কৃষ্ণময়। তাই তো শ্রীমতী হলেন শ্যামসুন্দরের স্বরূপ-শক্তি। শুধু তাই নয়—লীলা-সহচরীও বটে।

'মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥'

কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা। তিনি পূর্ণশক্তি।

কৃষ্ণ হলেন পূর্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান—এ দুই বস্তুতে প্রভেদ কি? কোন প্রভেদই নেই। লীলারস আস্বাদনের জন্যই কেবল দুই রূপ।

'রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥'

তেমনি গৌর আর গৌরময়ী, বিশ্বম্ভর আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বরূপতঃ একই। তবে এক হয়েও তাঁরা দুই হলেন কেন?

প্রিয়-প্রেম বিরহের দেখাতে স্বরূপ
নদীয়ায় অবতীর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়া রূপ।
মহাভাব স্বরূপিনী প্রিয়া আত্মহারা
হা গৌর! হা গৌর বলে—চোখে বহে ধারা।
এই কান্না প্রবর্তিতে গৌরাঙ্গ সুন্দর
প্রিয়া সহ অবতীর্ণ নদীয়া নগর।
এক এসে দুই হলো স্বরূপতঃ একই
মানস নয়নে তাঁর যুগলাঙ্গ দেখি।—লেখক

গৌরসুন্দর প্রিয়াকে কাঁদালেন। প্রিয়া কাঁদালেন জীবকে। জীব তাঁর অন্তরের অতল নিকেতনে ভগবানের জন্য আসন বিছিয়ে দিল। সেখানে প্রতিভাসিত হলো গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল তনু।

এ পুস্তক রচনায় যাঁরা আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসা, শক্তি ও সাহস দিয়ে প্রিয়াজীর বন্দনাব্রতে এগিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রামতনু অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আমারই অগ্রজ বালীগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত মহোদয়গণের ঋণ অপরিশোধ্য। এ ছাড়া আমার প্রিয় গৌরভক্ত শ্রীকেদার দে ও বিধু মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদি এবং মূল্যবান উপদেশ দ্বারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এ গ্রন্থ প্রণয়নে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও তাগিদ যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, তিনি হলেন প্রকাশক শ্রীঅমিয় বসু। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও সাহস না পেলে এত বড় দুরূহ কাজে হয়ত হাত দেওয়াই হয়ে উঠত না। এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।

মৃণালকান্তি

॥ এক ॥
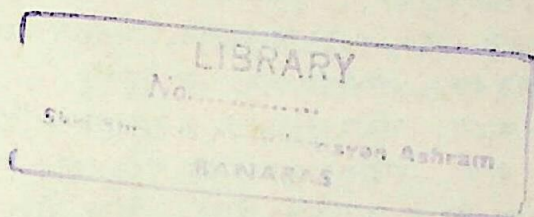
'কি নাম তোমার মা ?'

শুধালেন শচীদেবী। শুধালেন স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে।

মেয়েটি রোজ আসে গঙ্গায়। ভাবে বিনতা। দৃষ্টি দিগন্ত-বিসারী। কান্তি জ্যোছনা ক্ষরা। প্রশান্ত স্নিগ্ধতার মায়ামন্দির। ঠিক যেন একটি অভিসারিণী। তন্‌হা ক্লিষ্ট। তপোমৌন।

কিই-বা হয়েছে বয়স ? দশ কি এগারো। এগারো বছরের মেয়ে এসেছে গঙ্গায়! এ মেয়ের তো গঙ্গায় আসবার কথা নয়! তবে কেন আসে ?

আসবে না ?

ও মেয়ে যে এগারোতেই বসেছে তপে। নিয়েছে আলম্ব আতির। চলেছে নিরবধি অন্তরে আরাত্রিক। আরাত্রিক চলেছে অন্তিক সম্বন্ধ স্থাপনের। এ মেয়ে গঙ্গায় না এসে যায় কোথায় ?

গঙ্গায় এসেই তো সন্ধান জানবে গঙ্গোত্রীর।

তাই আসে। রোজ আসে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে। এ তার আশৈশবের চর্যা। গঙ্গার প্রতি মেয়েটির অচলা ভক্তি। অকুণ্ঠ আসক্তি।

সকাল।

পুবের আকাশে পড়েছে আরক্ত আলিম্পন। সূর্য উঠবে। পাখী গান গাইছে। সুরের মিড়ে ঝঙ্কৃত আদিগন্ত। জেগে ওঠে নবদ্বীপের

নগর-জীবন। করুণাময়ী জাগেন। ঘুম ভাঙ্গে শচীদেবীর। ইষ্টকে জানান প্রণতি। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। হাতে একটি ঘটি ও কাপড় একখানা। গঙ্গা স্নানে যাচ্ছেন জননী শচী। চিরাচরিত প্রথা।

অন্তরে চলছে অরুন্তুদ আর্তি।

কোনদিকে খেয়াল নেই। এ যেন ভাবের নভে পাখা মেলে দিয়েছে পাখী। আ-ঘাত-ক্ষত বক্ষ। বেদন-পৃক্ত হৃদয়। মন উড়ু উড়ু।

—এবারে লগন আনো। যাত্রার মহালগন। এ কান্না-করুণ পরিবেশ থেকে আমায় ছুটি দাও। নিবিয়ে দাও আজন্মের অনল দহন! আর তো পারিনা! কান্না দিয়েছ, হাহাকার দিয়েছ। দিয়েছ দীর্ঘশ্বাস। কৈ, কর্ম বিরতি দিলে না তো! তাই দাও। এবারে আমাকে তোমার কাছে টানো!—বেশ কিছুদিন ধরে এই ভাব চলছিল শচীদেবীর।

দিনের কর্ম করে যান। মন পড়ে থাকে যেন কোন অচিন দেশে। আঁকুবাঁকু করে চিত্ত। রিক্ত, শূন্য, শান্ত আজ শচীদেবী। তবুও কর্ম-প্রবাহের বিরতি নেই। তাই তো রোজ আসেন গঙ্গায়।

গঙ্গার ঘাটেই দেখা হয়—

দেখা হয় নিত্য ঐ মেয়েটির সঙ্গে। স্নান সমাপনান্তে প্রণতি জানায় সূর্যদেবকে। নিবেদন করে অন্তরের অনুক্ত আকুতি। যেন তার মন বলে - গ্রহণ কর আমার প্রণতি, পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা।

শুধু কি তাই?

সঙ্গে সঙ্গে শচীদেবীর চরণেও রাখে প্রণাম। ব্রীড়াবনতা একাদশী। দুটো কালো ডাগর চোখ। তাকায় একবার। শচীদেবীর চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায় আপন পথে—আপন কাজে!

নির্বাক শচীদেবী। তাকিয়ে থাকেন, তাকিয়ে থাকেন অপলক নয়নে। নাম, ধাম জিজ্ঞেস করবার পর্যন্ত সুযোগ দেয়না! প্রণাম করেই পালিয়ে যায়।

আশ্চর্য!

কে গা এই মেয়ে!

বিস্ময় লাগে জননী শচীর। কত লোক গঙ্গায় আসে। স্নান করে। জানায় যে যার আরাধ্যকে প্রণাম। মনের অজস্র বাসনার কথা বলে।

করে হা হুতাশ। চলে যায়। এমন তো কতই স্নানার্থী গঙ্গায় আসে। কিন্তু এ মেয়ের মত আর কেউ নয় তো! ও কেন আমার পায়ে মাথা রাখে!

ভেবে ভেবে একশা শচীদেবী। কত জিজ্ঞাসা যায় মনকে মন্থন করে। কিন্তু সমাধান হয় না। মেয়েকে ক্ষণকণার জন্যেও কাছে পায় না। যদি পেতেন তবে নিশ্চয় শচীদেবী জেনে নিতেন এ প্রণতির যথার্থ অর্থ। জিজ্ঞেস করতেন—আমাকে প্রণাম কেন মা?

তোমাকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে?

ও মেয়ের যে লগন এসেছে। বসেছে তার হৃদপদ্মে কৃষ্ণভ্রমর। কৃষ্ণ-প্রেমে অন্তর আপ্লুত। অভিসারে যাবে। তাই এ প্রণাম। তাই তো মা যশোদার আশীর্বাদ ভিক্ষা।

আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটি।

অপ্রতিম। ধীর শান্ত। আলুলায়িতকুন্তল। আনিতম্ব বিস্তৃত। টানা চোখ। মুখে মাখা সোহাগের আলিম্পন। অন্তর দ্বারে মঙ্গল কুম্ভ। অঙ্গে অঙ্গে তার অভিলষিতের দর্শনের উন্মুখ প্রতীক্ষা ও কি যে সে?

ওর অন্তরে আলোর উদ্ভাস। পেয়েছে শুক্লিমার ছোঁয়া। চাঁদ উঠবে। তাইতো চল্‌ছে পূর্ণিমার প্রাকৃপর্ব।

আজ শচী দেবী সিদ্ধান্তে অটল। আজ আর ছাড়ছেন না। নাম, ধাম, পরিচয়, সব জেনে তবে রেহাই।

ধীর পদপাত।

শচী দেবী দেখছেন তাকিয়ে। তাঁর দিকেই আসছে মেয়েটি। সেই শান্ত চরণ সঞ্চার। সেই স্নিগ্ধ মদির কান্তি। সেই দীপ্ত চপল আঁখি।

প্রণাম রাখল মেয়ে, যেমন রোজ রাখে।

সঙ্গে সঙ্গে শচী দেবী বলে উঠলেন—বাঃ, ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তো তুমি মা! সুখে থাকো! লাভ কর মনের মত বর! হও জন্ম এয়োস্ত্রী!

এ যেন করুণা নির্ঝর। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের বুকে হয়েছে হিম বর্ষণ। সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলো যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনল। শুনল শচী দেবীর আশীর্বাণী।

ও আর পা ফেলতে পারছে না। পারছে না মুখ তুলে তাকাতে। আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে শচী দেবীর সম্মুখে।

কেমন করে চোখ তুলে চাইবে ?

যে ভাষায় কথা কইত তার অন্তরের মৌন, আজ যে হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ।

শচী দেবীর মুখে হয়েছে উচ্চারিত, উচ্চারিত হয়েছে তার মনের মন্ত্র। প্রাণের কান্না। গোপন হয়েছে ব্যাপ্ত। রুদ্ধ দুয়ার গিয়েছে খুলে। বড় ভালো লাগে। ভালো লাগে আজিকার প্রভাতের এই নীলনির্মল আকাশ। গেরুয়া গঙ্গার চঞ্চলতা। মনের মত বর···জন্মএয়োস্ত্রী !

নত মস্তকে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার অন্তর-সমুদ্রে যেন বান ডেকেছে।

মা গো, অধিকার দাও অর্জনের। প্রশান্তি দাও প্রাপ্তির। আমার অন্তর দেবতা যে তোমারই উৎসঙ্গে। পারবনা কি তাঁর চরণ-মৃণালে অর্ঘ্য দিতে এই হৃদ-পদ্মের ?

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বেজে উঠল মেয়েটির মনের বীণায়।

সোহাগ ভরে চিবুক ধরলেন জননী শচী। মাথা তোল! চোখ চাও! এবারে বলো, বলো, 'তুমি কার মেয়ে মা—কি নাম তোমার ?'

সুধা নির্ঝর হলো।

মধুর কণ্ঠে মেয়েটি বললে—'প্রিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া !'

প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া! হ্যাঁ, সত্যি তুমি প্রিয়া। এমন যার মুখের আদল, চোখের চাওয়া, সে প্রিয়া নয় তো কি! তোমার অঙ্গে সমাহিত প্রশান্তি। অন্তরে অনন্তের অর্চা সমারোহ। এক অঙ্গে যার এতরূপ, সে শুধু প্রিয়া নয়—দেব-প্রিয়া ! বিষ্ণু-প্রিয়া। কৃষ্ণ-প্রিয়া।

'কার মেয়ে ?'

'আমি সনাতন মিশ্রের মেয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রমে শচী বললেন—'সনাতন মিশ্রের মেয়ে!' তবে তো তুমি মা মস্ত ঘরের মেয়ে। আশীর্বাদ করি, সুখী হও। সুন্দর হও। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' হও।

কি ছলে শুনিনু কথা
অন্তর ভরিল গো।

আত্ম সমর্পণ। আত্মনির্ভর। বিষ্ণুপ্রিয়া যে তার দেহ মন হিয়া

নিবেদন করেছে নিমাই পণ্ডিতকে। অন্তর দিয়ে অন্তরের পূজো। এ কি বিফলে যাবার? আত্মদানের মধ্যেই প্রসুপ্ত থাকে প্রাপ্তির প্রশান্তি। সে প্রশান্তির মাঝ থেকেই প্রতিভাসিত হয় পরমজন। তাকে ধরতে হয় চরম করে। দেখতে হয় আত্মপুরুষের ধ্রুব দীপ্তি। দেখতে হয় গোপনে, গহনে, বিরলে। তারপরে তাকে জাগিয়ে রাখো। জাগিয়ে রাখো স্মরণে, মননে ও ধ্যানে। বলো—তুমি জেগে থাকো। জেগে থাকো আমার উৎকণ্ঠিত অন্তর নিকুঞ্জে দীপ্ত সবিতার মত।

প্রিয়া কি তা রাখে নি?

রেখেছে।

শৈশবে ঢুকেছে পূজার অঙ্গনে। ভেসে উঠেছে বুঝিবা মনের মন্দিরে কৃষ্ণ-তনু। দেখেছে একটি নবীন কিশোর বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে। তার হাতে বাঁশী। পায়ে নুপুর। কণ্ঠে মতিহার। মস্তকে মোহন চূড়া। মন ভুলানো কান্তি। প্রিয়া তাকে বরণ করেছে। বরণ করেছে স্মরণে পরম স্বজন ভেবে। সরল বালিকা মনে মনে ভেবেছে, আমরি কিরূপ! এমন দোসর যেন আসে!

কৈশোর এলো জীবনে। প্রিয়া হলো কিশোরী বালা। কৃষ্ণ-কিশোরী। গোপনে মালা গাঁথে প্রিয়া। পরায় বিষ্ণুকণ্ঠে। পিতার অর্চিত বিগ্রহে। ক্রমে বনের পুষ্প ফোটে মনের কাননে। ঝড়ে পড়ে তা নয়ন নির্ঝরে—অশ্রুফুল হয়ে। বিষ্ণুর গলায় মালা পরিয়ে প্রার্থনা করে প্রিয়া, কৃষ্ণ-প্রীতি! কৃষ্ণ-প্রেম।

প্রিয়া-প্রিয়-প্রাণ ব্যাকুলা। কৈশোরের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে একবার চোখ মেলে তাকাল। কি দেখল প্রিয়া? দেখল তার যৌবন-তীর্থে মহাসমারোহ। আরও দেখল, দেখল তার বাঞ্ছিত দেবতাকে। সে যে তার অন্তরাসনে সমারূঢ়া। তার আশৈশব বন্দিত শ্যামশোভা যেন গৌরাঙ্গ চন্দ্রে রূপান্তরিত। সমস্ত প্রাণ মন, দেহ, যৌবন প্রিয়া উৎসর্গ করল—উৎসর্গ করল গোরাচাঁদের চরণতীর্থে।

হৃদয় দিয়ে হৃদি। এত দিন প্রিয়া অশ্রু-ফুলের মালা গেঁথেছে। দিয়েছে মনের মানুষের গলে। আজ কি হলো? জননী শচী এসে যেন তার জীবন নদীতে ঝড় জাগিয়ে দিয়েছেন। আকুল চিত্ত মানে না বাঁধা।

প্রিয়া যেন উত্তাল উদধিতে পড়েছে ঝাঁপিয়ে। কিন্তু তাঁকে পাবার মত কি আছে সম্পদ তার?

আছে তপ, তিতিক্ষা, তন্‌হা ও নাম। সেই নাম করতে করতে যদি নামীর পরশ মেলে!

প্রিয়া দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে আনত মস্তকে!

যাবার আগে শচী দেবী আবার হাত রাখলেন প্রিয়ার মস্তকে। করলেন আশীর্বাদ। চললেন এগিয়ে ঘরের পথে। কিন্তু পা তো চলে না! পিছু ফিরে তাকান শচী। দেখেন সেই শান্ত স্নিগ্ধ গৌরাঙ্গী গৌরী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাসে যেন সমস্ত বুকটা তাঁর ফাঁকা হয়ে গেল……প্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া! সনাতন মিশ্রের মেয়ে!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নারী মূর্তি তার মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেল বর্তমান। কে যেন তুলে ধরল বিস্মৃত দিনের সমাপ্তহীন অধ্যায়ের কয়েকটা ছিন্ন পত্র। বেদনায় আরক্তিম শচীর মুখ। আঁখি ছল ছল। মন হাহাকার করে উঠল—নেই…নেই মোর ঘরে প্রিয়া নেই—লক্ষ্মীপ্রিয়া!

সে আর এক অধ্যায়। আর এক কাহিনী।

॥ দুই ॥

দুঃখ আছে সংসারে। কান্না আছে হৃদয়ে। সব কিছুকে নিতে হয় মেনে। মেনে নিতে হয় যুক্তি বিচারের সান্ত্বনায়। চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় হৃদয়ের কান্না। কিন্তু নেই কি সে কান্নার নিবৃত্তি?

আছে। যেখান থেকে উৎসার, সেখানেই নিবৃত্তি। দহনের উৎপত্তি অন্তরে। তার নিবৃত্তি কোথায়? অন্তরেরই সু-গহনে।

সব সত্য। সব অকাট্য। তবুও শচীর চোখে জল। বুকে ব্যথা। কেন?

প্রিয়া—বিষ্ণু-প্রিয়া।

বিষ্ণু-প্রিয়ার পানে তাকিয়ে শচীর রুদ্ধ-হৃদয়ের দুয়ার গিয়েছে ভেঙ্গে! এ যেন কত কাছের। কত আপনার জন। অতীত জীবনটা শচীর বড় বেদনার। অনেক কেঁদেছেন তিনি। অনেক আঘাতকে নিয়েছেন সহ্য করে। কিন্তু আজ আর পারছেন না সামলে রাখতে নিজেকে। দুচোখ ঠেলে জল এলো। ঝড় জাগল অন্তরাকাশে। স্মৃতির বাসর থেকে কারা যেন উঁকি মেরে তাকায়। হারিয়ে যায় বর্তমান। সজাগ হয়ে ওঠে অতীত।

প্রিয়াকে দেখে শচীর এমন হলো কেন?

প্রিয়জনকে কাছে পেলে এমনই হয় রে! মন যেন তখন বলে—অমার কান্নার অংশ নাও তুমি। আমার দুঃখের ভাগ কিছু গ্রহণ কর। জানাও আমার বেদনায় সহানুভূতি। আমার কাছে এসো।

প্রিয়া যে শচীর জন্ম জন্মান্তের পরিচিতা। তাইতো তাকে কাছে পেয়ে শচী আজ উদ্বেল। অশান্ত। মনের মৌন মুখর হলো শচীর। বিস্মৃত অধ্যায়ের পাতাগুলোকে যেন কে মেলে ধরে চোখের সামনে।

শচী অপলক। তাকিয়ে থাকেন সেই কাহিনী, সেই কথা, সেই ইতিহাসের পানে!

পর পর আটটি কন্যা এসেছিল শচীর কোলে। স্নেহ দিয়ে, মাতৃ-বক্ষের স্তনধারায় তাদের বড় করবে—এই ছিল জনক-জননীর আশা। কিন্তু সব বিফল হয়ে গেল। ওরা ঝরে পড়ল কোরকেই। কি রইল অবশেষ? রইল, একটা সু-দীর্ঘ আর্তনাদ! আর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস!

শচী-পতি জগন্নাথ মিশ্র। ধর্মপ্রাণ, পণ্ডিত। বাইরের এ আঘাতকে ঈশ্বরের পরম দান বলেই তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবুও মায়ামুগ্ধ মন মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখন তিনি তাঁর গৃহ বিগ্রহের পানে তাকিয়ে ডাকেন রঘুনাথকে। প্রাণের সব কান্না ঢেলে দেন রঘুর রাঙ্গা পায়ে।

মিশ্র ধরেছেন। শক্ত করে ধরেছেন রঘুনাথকে। একেবারে রিক্ত হয়ে। রিক্ত না হলে যে সিক্ত হওয়া যায় না। রঘুনাথের জন্য কান্নায় সিক্ত না হলে রঘু আসবে কেন?

এবারে মুখ তুলে চাইলেন রঘু। শচীর নবম গর্ভে এলো বিশ্বরূপ।

প্রাণ ভুলান কান্তি। জ্ঞানে গুণে নবদ্বীপের নয়নতারা বিশ্বরূপ। ধর্মকর্ম, চতুষ্পাঠী, টোল, শাস্ত্র আর কীর্তন—এই নিয়েই দিন কাটে তাঁর।

বিশ্বরূপ এসেছে জমি আবাদ করতে। সোনা ফলাবে মিশ্রর ঘরে। রাজা আসবার আগে কি করে? পথে পথে প্রহরা নামে। সকলকে জানিয়ে দেয়, রাজা আসছেন। তোমরা তাকে অভ্যর্থনা জানাও। বরণ কর। স্মরণ কর। তৈরী হয়ে থাকো তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্যে।

তাই বিশ্বরূপের অন্য ভাব। ঘরে নেই আসক্তি। মন নেই বিষয়ে। সে তাড়াতাড়ি করে কাজ সমাধা করছে। বিশ্বরূপ যে শুনতে পেয়েছে বিশ্বপতির পদ-ধ্বনি। সে আসছে!

ওদিকে কান্না থামে না কমলাক্ষ মিশ্রের। বৈষ্ণবাচার্য কমলাক্ষ। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। সাধন ভজনে দিন কাটে তার। রাত্রির শিয়রে বসে থাকেন অতন্দ্র প্রহরীর মত। পূজোর অঙ্গনে ঢুকে পারেন না পূজো করতে। দুচোখ সিক্ত হয়ে আসে জলে। বুকের পাজর ঠেলে জাগে কান্নার মন্ত্র। আর্তনাদ করেন কমলাক্ষ। প্রাণের সমস্ত আবেগ, সমস্ত বেদনা নিবেদন করেন শ্যামসুন্দরের চরণ-তীর্থে। আর্তকণ্ঠে ডাকেন— ওগো, তুমি এসো! জীবের বড় দুর্দিন। ভক্তি নেই। ভালোবাসা নেই। নেই এক বিন্দু প্রেম। সাধন নেই। ভজন নেই। নেই ঈশ্বরে বিন্দু আসক্তি। এ দুর্দিনের আঁধার সায়রে তুমি এসো। এসো আলোর প্লাবন নিয়ে। তুমি না এলে, কে তাদের আলো ধরবে। কে দেখাবে পথ?

কমলাক্ষ অধীর। বারে বারে অন্তরে ডুকরে ওঠে কান্নার কাতরিমা —নৈয়ায়িকগণ তোমাকে গড়ছেন ভাঁগছেন অহরহ। বৈদান্তিক প্রচার করছেন—সোহহং। তার্কিক পণ্ডিতগণ বলছেন, তুমি নেই। তারাই ভগবান। পূজো করবে কার? প্রেমধর্মী বৈষ্ণবদের ওপর চলছে নির্যাতন। তাদের প্রেমের ঠাকুরকে ওরা নিন্দা করছে। আঘাত হানছে। জ্ঞানের গর্বে প্রেমকে করছে উপেক্ষা। ভক্তিকে বলছে ন্যাকামো।

তান্ত্রীক আবদ্ধ হয়ে আছে পশ্বাচারে। বীরাচারের সমর ভূমিতে নেমেছে অসংযমের ঢল। দিব্যাচারের স্বপ্ন সুদূরপরাহত।

অভিমানী কমলাক্ষ দিনের পর দিন এইভাবে আহ্বান করে চলেছেন জীববন্ধুকে।

তুমি না বলেছ—

আমায় ডাকিলেই পাবে
কাঁদিলেই পাবে
পাবে মনে মনে জপিলে নাম ?

তুমি না বলেছ—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ॥

তবে কি সব মিথ্যা হয়ে যাবে ? আমার আজন্মের বিশ্বাস, আজন্মের কান্না কি নৈস্ফল্যের অন্ধকারে অবলীন হয়ে যাবে ? তুমি কি আর আসবে না ?

কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগীর কণ্ঠে বিরামহীন কান্না। ভগবানের আসন টলে উঠল। বৈষ্ণব-ভক্তগণ যুক্ত করে প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সমুপস্থিতি। কমলাক্ষ, মানে আমাদের অদ্বৈতাচার্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরাও বললেন—হে প্রভু, তুমি এসো !

অদ্বৈতের কান্নায় চৈতন্য অবতীর্ণ হলেন। অবতীর্ণ হলেন জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে, শচীর গর্ভে।

১৪০৭ সক, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ।

সবে নেমেছে সন্ধ্যা। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূণ্য রাত। তার ভেতরে আবার চন্দ্রগ্রহণ। নদীয়ার ঘরে ঘরে বেজে উঠল শঙ্খ। হুলুধ্বনিতে মুখর হলো আদিগন্ত। ভক্ত প্রাণে জেগে ওঠে প্রার্থনার মন্ত্র—এসো, এসো হে নাথ ! তুমি অবতীর্ণ হও। জীবকে রক্ষা করো।

ঠিক তখন ভূমিষ্ঠ হলো শিশু। শচীদেবী বিস্ময়ে বিমূঢ় ! এমন রূপ !

মালিনী বলে—ওরে, এমন রূপ কেউ দেখেনি কোথাও।

মিশ্রের অঙ্গন মুখর হলো। শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনিতে হলো ঘোষিত প্রভুর আগমন বার্তা। তিনি এলেন। এলেন নদীয়া-জীবন। পতিত-পাবন ! জীববন্ধু !

শিশুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর নাম রাখলেন—বিশ্বম্ভর।

বিশ্বের ভার যিনি বহন করবেন, তিনি বিশ্বম্ভর নয় তো কি ?

মেয়েরা বললে—ওর নাম—গৌরহরি। গৌর-হরি। তা তো বটেই। হরিই যে এসেছে রে গোরা রূপে।

আবার কেউ বা বললে—তা যখন ছেলের এমন অঙ্গকান্তি, তখন তার নাম রাখো—গৌরাঙ্গ !

কিন্তু মায়ের দেওয়া নাম হলো নিমাই। কেন ? নিম গাছের নিচে ভুমিষ্ঠ হয়েছে বলে শচী বলেন—ওর নাম আমি রাখলেম নিমাই।

উপনয়নের অঙ্গনে আনন্দের হিল্লোল। ন'বছরের নিমাইয়ের অনন্ত নাম। এ নামের অন্ত নেই। সীমা নেই। শত নাম। হাজারো নাম। কোটী কোটী নাম রেখে তাকে ডাকো।

* * * *

বিশ্বরূপ আর বিশ্বম্ভর।

শচীর দুটি চোখ। জনক জননীর দুটি মন।

রঘুনাথ সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। মিশ্রের সংসার তো সংসার নয়—যেন বিশ্বপরিবারের কেন্দ্র পীঠ। ভগবানের সংসার।

বিশ্বরূপ বড় হয়েছে। কৈশোর থেকে পদার্পণ করেছে যৌবনে। জগন্নাথ মিশ্র বললেন—এবারে বিয়ে থা-র ব্যবস্থা করো বিশ্বরূপের।

শচীদেবী আনন্দে আত্মহারা। বললেন—তাই করো। খুব সুন্দর মেয়ে আনবে। আমার বিশ্বরূপের পাশে যেন বিশ্বরূপা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চলল মেয়ে দেখার পর্ব ! কিন্তু কথাটি কানে গেল বিশ্বরূপের। কেমন যেন হয়ে গেল সে। তার কাজ তো সমাধা হয়ে গেছে। নদীয়ার ভূমিতে চন্দ্রোদয় হয়েছে। 'এবারে অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে।'

বিবাগী মন বিশ্বরূপের। ও সব বিয়ে থা সে কিছুতেই করবে না। মনে মনে নিজেকে তৈরী করে নিল। তার সিদ্ধান্তে সে অটল। গ্রহণ করবে সন্ন্যাস।

বন্ধু লোকনাথ বললে—'তবে আমিও সন্ন্যাসী হবো।' যেখানেই যাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে।

একদিন একখানা পুঁথি নিয়ে এলো বিশ্বরূপ। দাঁড়াল মায়ের কাছে। বলল, 'নিমাই বড় হলে, এই বইটা তাকে দিও। বলো, তোর দাদা দিয়েছে।'

শচী বলেন··'আমি দিতে যাবো·কেন? তুই-ই দিবি। রেখে দে তোর কাছে।'

বিশ্বরূপ পড়ল বিপাকে। যেমন করে হোক এ পুঁথি মাকে গছাতেই হবে। সময় তো আর নেই। ---লেখাপড়া শিখেছি। কোথায় বিদেশ, বিভুঁইয়ে চলে যাবো। তখন হয় তো মনেও থাকবে না। তুমিই রেখে দাও মা!

হাত পেতে পুঁথি নিলেন শচী। বিশ্বরূপ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পুঁথিখানা তোরঙ্গে তুলে রাখেন শচী।

একটা মস্ত কাজ সমাধা হয়েছে। আর ভাবনা নেই। এবারে তার পথ মুক্ত। আজন্মের মতন চলে যাবে বিশ্বরূপ। তার ছোট ভাই নিমাই! তাকে কিছু একটা দিয়ে যাবার বাসনাই তার মনকে পেয়ে বসেছিল। কাজটা একরকম হয়ে গেল।

সরলা জননী। তাঁর সঙ্গে এতবড় একটা অভিনয়! বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল বিশ্বরূপ। কিন্তু আর কোনও উপায় তো ছিল না। তাই তো বিক্ষত মনকে অনেক করে প্রশান্ত করেছে বিশ্বরূপ। গোপনে ফেলেছে দীর্ঘশ্বাস। মুছেছে নয়নের জল।

সহসা মনটা তার খাঁ খাঁ করে উঠল। চোখের সামনে আভাসিত হলো গেরুয়া পথ। ওখানেই জীবনের পরা প্রশান্তি। তবুও পিছু টানে কে? বিদিশার অন্ধকারে পথ দেখে না বিশ্ব। হাহাকার করে ওঠে মন। না, না! জৈব নয়। চাই দৈব। দৈবকে লালন করব। পালন করব। করব অন্তরের দোসর। দৈবই হোক আমার জীবনের ধ্রুব ভাবনা।

শীতার্ত রাত। তৃতীয় যাম। বিশ্বরূপ দূর থেকে প্রণাম রাখল শচীর পায়ে। প্রণাম রাখল পিতার উদ্দেশ্যে। নিমাইয়ের পানে তাকাল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো। আর নয়। আর দাঁড়াতে পারল না। বলল বন্ধু লোকনাথকে—ওরে লোকনাথ, চল।

সন্ন্যাস নিল বিশ্বরূপ। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে গেল জনক জননী আর ছোট ভাইকে ফাঁকি দিয়ে।

মিশ্রের নবম সন্তানও রইল না।

শচী কাঁদলেন। নিমাই হলো মূর্ছিত। কিন্তু জ্ঞান ফিরে এলে মাকে সান্ত্বনা দিলে। বললে—দাদা গেছে, তুমি কেঁদোনা সে জন্যে। আমি দূর করব তোমার সর্ব সন্তাপ।

জগন্নাথ মিশ্র কিন্তু সামলে উঠতে পারলেন না। বৃদ্ধ পিতা এত বড় আঘাত কি করে সইবেন? ষাট বছর হয়েছে বয়স। ভাঙল দেহ। মন তো কবেই ভেঙ্গেছে। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। জ্বর এলো। এলো মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। তিনিও বিদায় নিলেন। সারাটা সংসারে নেমে এলো বিষাদের হিম ছায়া। এগারো বছরের ছেলে নিমাই। তার হাত ধরে শচী মুছে ফেললেন এয়োতির সকল চিহ্ন।

শচীর কি রইল অবশেষ?

রইল বুকের দহন। চোখের জল। আর রইল, শেষ সম্বল তাঁর নিমাই।

এই তো শচীর পরম মুহূর্ত। নিমাইকে পেতে হলে যে সব কিছুকে হারাতে হয়। তা শচী হারিয়েছেন। এবারে বাৎসল্যের খেলা। স্নেহের প্রার্থনায় চলবে ঈশ্বর আরাধনার পর্ব। শচীর দুলাল নিমাই কি যে সে?

'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং চৈতন্যাখং প্রকটং কৃষ্ণ স্বরূপং।'

রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন নিমাই, আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে।

॥ তিন ॥

ঝর চলে গেল—

ঝড়ের পর ঝড়।

শচী দেবী শূন্য। শান্ত। সব হারিয়ে বসে আছেন। বসে আছেন নিমাইকে সম্বল করে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন হয়ে পড়ল উদ্‌বিগ্নমনা। এলো তার মনে চাঞ্চল্য। বেদনায় টন টন করে উঠল বুকের মধ্যটা।

শ্রীকৃষ্ণ করলেন কি ?

ভাঙ্গলেন অর্জুনের মোহ। বললেন—'মামেকং শরণং ব্রজ।' আমাকে স্মরণ করো।

নিমাইও যেন তাই বলছে। বলছে শচী দেবীকে। তবে আর ভাবনা কি ? সব ভুলে যাও। এক মন, এক চিন্তা, এক ভাব নিয়ে বসো। স্মরণ করো তাঁকে। তাঁকে স্মরণ করলেই তোমার সর্ব সন্তাপ বিদূরিত হবে। সব দুঃখাগ্নি নির্বাপিত হবে। সব কান্নার হবে পরিসমাপ্তি। লৌকিক জগতে তুমি তার মাতা। কিন্তু পারলৌকিক ক্ষেত্রে ? তুমি ভক্ত। নিমাই ভগবান।

তবে তাই হোক। আমি তোকে নিয়েই থাকি। তোর পরিচর্যার মধ্যেই আত্মমগ্ন হয়ে যাই।

শচী দেবীর আর কোন ভাবনা নেই। নেই কোন চিন্তা। তাঁর মনে অপার শান্তি। করুণাময়ী নিমাইয়ের পানেই অপলক চোখ রাখেন। করেন সংসারের ছোট বড় কাজ।

চৌদ্দ বছরের ছেলে নিমাই। খুলেছে টোল। নবদ্বীপের পণ্ডিত—

সমাজে টোলের অধ্যাপক ? এ কথা ভাবতেও যে শিহরণ জাগে। বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ ! জ্ঞান-তীর্থ।

অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার, ছাত্রবেশী নিমাই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতেই। তারা বলে—এমন পড়াতে পারেন কে ?

যেমন ছাত্রের ভিড়, তেমনি অর্থের প্রাচুর্য। অভাব ঘুচেছে সংসারের। এসেছে সচ্ছলতা। স্বাচ্ছন্দ্যের বান ডেকেছে।

আসবে না কেন ?

সর্বত্র নিমাই, নিমাই, আর নিমাই। সকলের কর্মে ও মর্মে ছড়িয়ে আছে নিমাই। নিমাই বলতে নম্রনত হয় নদীয়ার নগর জীবন। জানায় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের প্রণতি। খ্যাতিমান পণ্ডিত হয়েছে নিমাই। সম্মান তার আকাশ-বিসারী। দিগন্ত ব্যাপ্ত।

এবারে ঘর বাঁধো শচী। ছেলেকে টানো সংসারে। বিয়ে থা দাও।

প্রস্তাবটি আনল বনমালী ঘটক। কথাটা রাখলো শচী দেবীর কানে। আনন্দে আত্মহারা শচী। ঠিক এমন একটি দিনের প্রতীক্ষায় তিনি অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন।

তা বেশ তো। বলি, মেয়ে কার গা ?

বল্লভাচার্যের মেয়ে।

নাম ?

লক্ষ্মী।

যিনি ছিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি, তাঁর কাছে লক্ষ্মী না হলে কি মানায় ?

দেখতে কেমন ?

তা বলে বুঝবার নয়। অপূর্ব।

শচীদেবী একটু চিন্তাচ্ছন্ন হলেন। সহসা উঠলেন আঁতকে।—এই ছাখো, আমাদের লক্ষ্মী ? তাকে যে আমি চিনি। সে মেয়ে যে আমার ছাখা আছে।

তবে তো কথাই নেই।

তাছাড়া,—

আর যেন কথাটা বলতে পারলেন না শচীদেবী। শুধু একটু মুচকি হাসলেন। একটা অব্যক্ত আনন্দের হিল্লোল যেন তাঁর মনকে দিয়ে গেল দোলা। লক্ষ্মী, সে যে নিমাইয়ের কৈশোর সঙ্গিনী ছিল। কত খেলা। কত লীলা। কত কীর্তি এই লক্ষ্মীকে নিয়ে। লক্ষ্মী, যে ছিল নিমাইয়ের অন্তরতমা! সে সব কথা কি শচী ভুলেছেন ?

'মেয়েরা আসত স্নান করতে গঙ্গায়। হাতে পূজোর থালা। আছে

তাতে ফুল আর বিল্বপত্র। নৈবেদ্য আর মিষ্টি মণ্ডা। তাড়াতাড়ি পূজোর কাজ সমাধা করবে তারা। কেন? যদি নিমাই এসে পড়ে, তবে সব পণ্ড।

সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের গৌরতনু ভেসে ওঠে তাদের মনে। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তারা থাকে তাকিয়ে। মন বলে—এমন রূপ আর হয় না। অজান্তে চলে মনন সাধন। তোমার সমুপস্থিতি পীড়াদায়ক। তোমার সান্নিধ্য দুঃসহ। না, তুমি এসো না।

এতো মুখের কথা। কিন্তু মন যে মগ্ন। নিমাইয়ের প্রতি তাদের আসক্তির কি পরিসীমা আছে?

মনের টানে মন আসে। ঘরে বসেছিল নিমাই। সহসা টন্ টন্ করে উঠল মন। নিমাই ছুটে এলো গঙ্গার ঘাটে। পড়ল ঝাঁপিয়ে জলে। পায়ের জল ছিটে এলো স্নানার্থীদের গায়ে। তারা তো অগ্নিশর্মা।

অবুঝ মন, চিনল না কার চরণামৃতে অভিসিক্ত হলো আজ তারা। এ যে শান্তিবারি। সকলের দেহশুদ্ধি হয়ে গেল নিমাইয়ের চরণ-স্নাত জলে। এবারে পূজো প্রার্থনা। ভক্তের দুয়ারে ভগবান করছেন প্রেম ভিক্ষা।

পারে উঠে এলো। দাঁড়াল কুমারী মেয়েদের কাছে। বলল 'আমাকে পূজো কর। তোদের বর দেব আমি।'

মেয়েরা বললে—আমার সোনার চাঁদ! 'তুই কি দেবতা যে তোর পূজো করব আমরা?'

নিমাই বললে—'দেবতাই তো।'

ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু গুঞ্জরণ তার ভুবন বিসারী। দ্যাখো, তোমার সম্মুখে কে? ঐ মেঘ কজ্জল আয়ত আঁখি থেকে অবিরত বর্ষিত হচ্ছে প্রেম-ধারা। গৌর অঙ্গ রোমাঞ্চিত। মুকুলিত। তাঁর দেহদ্যুতি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি।

শ্রীরাধা বললে—

> 'কোটি নেত্র নাহি দিলে, সবে দিলে দুই
> তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুক্রি।'

কৃষ্ণ-রূপ, কৃষ্ণ-মাধুরী দর্শন করতে হলে কি চাই ? রাধা বললে, কেন কোটী নেত্র দিলে না ? কৃষ্ণ দর্শনে চাই কোটী নেত্র। কিন্তু বিধাতা দিলেন শুধু দুটি আঁখি। তাতে আবার দিলেন নিমিষ। দিলেন পলক। সে যে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আমি কি করে দেখব কৃষ্ণ মাধুরী ?

গোপীরা অভিসম্পাত দিলে বিধাতাকে। কেন ? কেন কোটী নেত্র দিলেনা। কেন নয়ন থেকে নিমিষ কেড়ে নিলে না। বিধি, তোমাকে শত ধিক !

শ্রীকৃষ্ণ যে তার শ্যামরূপে ঢেকে ওদের কাছে এসেছে গৌর রূপে। কি করে চিনবে ওরা। না চিনুক, গৌরকিশোর তা বলে চলে যাচ্ছে না তার লীলাঙ্গন থেকে।

ফুল আনল সাজি থেকে। দিলে মাথায়। নৈবেদ্যের থালা উজার করলে। মিষ্টিমণ্ডা একটিও রাখলে না। সব খেয়ে ফেলল নিমাই। এ যেন স্বচ্ছন্দ গতি।

কিন্তু আরক্ত আঁখি কুমারীদের। তারা বললে—'বড় বাড় বেড়েছিস, না ? ঠাকুর দেবতার নৈবেদ্য কেড়ে খেলি ! বুঝবি, টের পাবি মজাটা পরে।'

বেপরোয়া নিমাই। কি আবার টের পাবে। তার আরাধনায় যে দেবদেবীও রত।

সব হেসে উড়িয়ে দিলে নিমাই। সব কথাকে করলে অগ্রাহ্য। এ যেন নির্ভুল কর্ম। কোন ভয় নেই। ভাবনা নেই। যা করছে যেন ঠিকই করছে।

রসিক নাগর বঙ্কিম ঠামে এসে দাঁড়াল আর একদল মেয়ের কাছে। বললে—'আমাকে বিয়ে করবি ?'

লজ্জায় তারা নত করে মাথা। তাকায় ইতি উতি। কেউ বুঝি শুনে ফেলল নিমাইয়ের প্রস্তাব।

ভয় নেই কিছু নিমাইয়ের। আবার বললে ওদের পানে তাকিয়ে। বললে, 'দে না তোর ঐ ফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে।'

গলা এগিয়ে দেয় নিমাই ! নিশ্চলের মত সবাই থাকে দাঁড়িয়ে। মনে মনে সরমে যায় মরে।

৪।৭৭

নিমাই দেয় অভিশাপ।—দিলে না তো মালা? তবে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। 'তোর বুড়ো বর হবে।'

শিউরে ওঠে সবাই। রাগে, দুঃখে অভিমানে মেয়েরা জ্বলে ওঠে। মনে মনে নিমাইকে করে গালাগালি।

নিমাই নির্বিরোধ। এও যেন তার কানে মধু বর্ষণ করছে। নাইবা করবে কেন? 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥'

মাতা আমাকে বন্ধন করেন পুত্রভাবে। লালন করেন অতিহীন জ্ঞানে। সখাগণ আমাতে আবদ্ধ বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমে। তারা আরোহণ করে আমার স্কন্ধে। বলে, তুমি আমি সমান। তুমি কোন্ বড়লোক হে?

কিন্তু প্রিয়া?

প্রিয়ার মান, প্রিয়ার ভৎর্সনায় ক্ষরিত হয় মধু। বর্ধিত হয় আনন্দ। তা আমাকে করে অধিক মুগ্ধ। এমন কি বেদোক্ত স্তুতি পাঠ থেকেও।

তাই তো নিমাই আসে। আসে শত ভৎর্সনায়ও ওদের কাছে ফিরে। থাকে ঘিরে। প্রেম-পুরুষ প্রেমাকাঙ্ক্ষী। তাই আসে প্রেমের হাটে বাজারে একটু প্রেম প্রার্থী হয়ে।

অদূরে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। হাতে পূজার থালা। ফুলে ফলে, নৈবেদ্যে পূর্ণ।

নিমাই হাজির হলো। হাজির হলো বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর কাছে। আয়ত আঁখি। আনিতম্ব কেশগুচ্ছ। গৌরাঙ্গী। রূপের আভায় যেন আকর্ষণের সম্মোহন।

নিমাই বললে—তুমি আমাকে পূজো করবে?

নির্বাক নিবেদন—করবো।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। পূজোর থালা রাখে নিচে। জানু ভেঙ্গে বসে। দেয় নিমাইয়ের পাদ-পদ্মে ফুলের অর্ঘ্য। মনে মনে বলে—এই তো আমার আজন্মের দেবতা। সর্বতীর্থের সেরা তীর্থ এই চরণ-যুগল। গ্রহণ কর আমার অর্ঘ্য। গ্রহণ কর আমার অর্চা।

গলায় মালা পরিয়ে দিলে লক্ষ্মী। চন্দনে চর্চিত করে দিলে ললাট।

কুমকুমের তিলকে সুশোভিত করল ভ্রূ-সন্ধি। লক্ষ্মী বিহ্বলা। সুপ্রসন্না। আনন্দক্ষরা।

নৈবেদ্যের থালা তুলে দিলে হাতে। রাখলো চরণে প্রণাম। একেবারে পূর্ণাহুতি। নিবেদনের অন্তপর্ব।

গোরা অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু
তিল তুলসী দিয়া।

তিল তুলসী দ্বারা নিবেদিত বস্তু আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তখন আর আমার আমি থাকে না। তোমার হয়ে যায়।

ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীরা কৃষ্ণ-প্রিয় কর্মের জন্য আকুল। বলে—লাজ, মান, ভয়—কুল, শীল, জাত, সব ত্যাগ করতে রাজী আছি। কেবল তোমাকে চাই। চাই তোমাতে নিবেদন করতে প্রেম ভক্তি।

সে কেমন প্রেম?

আর সে ভক্তিরই বা স্বরূপ কি?

তাকাও নক্ষত্র খচিত আকাশের পানে।

কি দেখছ?

ক্ষরিত লাবণী।

তাকাও পূর্ব-দিগন্তে।

কি দেখছ?

শুভ্রচ্ছটা।

ও চ্ছটা নয়, ঊষা। ঊষা মগ্না। তন্ময়া। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কোথায় হলো তার পর্যবসান?

অরুণোদয়ে।

এই এগিয়ে আসাটুকু হলো অনুরাগ, রতি, ভালোবাসা। আর ঐ পর্যবসানের নাম হলো প্রেম। রতি গাঢ় হয়ে হলো প্রেম। কিন্তু এখানেই থেমে গেল না ব্রজগোপীরা। বললে আরও চাই।

কি চাই?

চাই তোমার সুখ সম্পাদন করতে। সুখ-স্নাত করতে চাই তোমাকে। তোমাতে নিবেদন করবো সেবা। নিবেদন করবো প্রেম। যে সেবায় তুমি হবে আহ্লাদিত। আনন্দিত। এমন সেবার অধিকার দাও!

কৃষ্ণে প্রীতি। কৃষ্ণে ভক্তি। কৃষ্ণে রতি। উৎসাধন করো তোমার ঐশ্বর্য ভীতি। সঙ্কুচিত করো সঙ্কোচকে। সরিয়ে দাও লাজের গুণ্ঠন। ঘুচিয়ে দাও সকল অন্তরায়। তুমি নেমে এসো। নেমে এসো তোমার স্বর্ণ-সিংহাসন থেকে আমাদের পর্ণকুটিরে। তার পরে হবে নিবেদন। বিতরণ হবে মিলনের মাধুরী। আমরা তোমাকে নিবেদন করতে চাই আমাদের ভক্তি।

সে ভক্তির স্বরূপ কি ?

গোপীদের কণ্ঠে সারল্যের সুনির্মল অনুরণন—চাইনা বৈধীর বৈকুণ্ঠ। নিয়ে চলো আমাদের রাগানুগার বৃন্দাবনে।

বৈধী আর রাগানুগা। দুই-ই ভক্তি। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে আসমান জমিন ফাঁরাক।

"ঐশ্বর্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা।"

এ হলো ভগবানের ঐশ্বর্যরূপের সাধনা। বিধিমার্গের ভজন। ভক্তকে এ সাধনে প্রবৃত্ত করে ঈশ্বরের শক্তি-ভীতি। তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর বিভূতির প্রতি-নিয়ত মন মগ্ন থাকে। প্রার্থনার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—হে প্রভু! হে ঐশ্বর্যময়, সর্বশক্তিমান, তোমার চরণতীর্থে রাখো আমার আজন্মের অনুরাগ। তোমার শক্তিতে আমাকে করো শক্তিমান। আমি তোমার দাস।

যেমন ঘরের রাঁধুনী। রাঁধুনীর কাজ কি ? রান্না করা। বাবুর বাড়ি থেকে মাইনে নেয়, বিনিময়ে দেয় রান্না করে। মাইনের চাকর। ভালো মন্দের বালাই নেই। বাবুর রসনাতৃপ্ত হোক। বাবু ভালো বলুক। এ সকল প্রার্থনা মনে জাগলেও তা অর্থকেন্দ্রিক। বাবু রাঁধুনীকে ভালো বললেই রাঁধুনী বলবে—দাও আমাকে মাইনে বাড়িয়ে। এখানে বাবুর সঙ্গে নেই রাঁধুনীর কোন অন্তরের মিল। রাঁধুনী বাবুর তৃপ্তি সাধন করে না। সাধন করে থাকে অর্থের।

বৈধী মার্গের সাধক ঠিক তেমনি। তোমার সুখ হোক। তোমার শান্তি হোক। তোমার আনন্দ হোক। এমন একটি প্রার্থনাও তার অন্তরে জাগে না। তার দৃষ্টি কেবল ভগবানের ঐশ্বর্য, শক্তি, আর

বিভূতির দিকে। ঐ-ই যেন তার একান্ত কাম্য। একান্ত প্রাপ্য। একান্ত আরাধ্য।

ফলে লাভ হলো কি?

লাভ হলো ভগবানের ঐশ্বর্যের দু' একটি কণামাত্র। এতেই খুশী। এতেই তৃপ্তি।

আমি বৈকুণ্ঠ পেলেই খুশী থাকব। আমাকে বৈকুণ্ঠে যাবার অধিকার দাও। কেবল প্রাপ্তির প্রার্থনা।

গোপীরা তা চায় না। না সিদ্ধি, না মুক্তি, না লীন হবার বাসনা। তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে তুমি থাকো। তোমার শক্তির খেলা খেলতে আমাদের কাছে এসোনা।

তবে কি চাই?

চাই তোমাকে?

এ বড় কম কথা নয়? একেবারে ভগবানকেই চেয়ে বসল—গোপীরা! চেয়ে বসল তার সুখ-সাধন করতে!

কিন্তু ভগবানের সুখ সাধন! তা কি করে সম্ভব? যিনি সকলের সুখের মালিক, দুঃখের মালিক—তার সুখ সাধন করা তো সহজ কথা নয়!

তা কি ভাবে সম্ভব?

আছে, সে পথও আছে।

কোন্ পথ?

রাগানুগার পথ।

তার স্বরূপ কি?

শাস্ত্র বলে একে ব্রজের ভাব। রাগানুগাভক্তি।

একেবারে মানবীয় ভাব।

তুমি আকাশ—আমি মাটি।

তুমি সাগর—আমি পুকুর।

তুমি প্রভু—আমি ভৃত্য।

তুমি বিরাট—আমি ছোট।

না, না, না। এমন ভাবে মিলতে বাসনা নেই গোপীদের।

তারা বললে আরও চরম কথা। পরম কথা। বহিরঙ্গা বৃত্তি নয়। চাই তোমার অন্তরঙ্গা রূপ। তুমি গোপীবল্লভ। তুমি গোপীনাথ। তুমি গোপীপ্রাণ। ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৃন্দাবনপতি। তোমাতে আমাতে মিলন হবে প্রিয়-প্রিয়ার সম্বন্ধে। সখা-সখীর সম্বন্ধে। যুবক যুবতীর আকর্ষণে। যোগীর কাছে তুমি পরমাত্মা হয়ে থাকো। থাকো জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হয়ে। ভক্ত তোমাকে ভগবান বলে ডাকুক। আমরা তা পারব না। অত শত পরমাত্মা, ব্রহ্মের বুঝিইবা কি ?

তবে কি বোঝ ?

'রূপ দেখে আঁখি ঝুরে
গুণে মনো ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।'

তোমার প্রতিটি অঙ্গ অর্চার জন্যে আমরা উন্মুখ। তোমার দেহকান্তির আকর্ষণে আমরা উন্মনা। তোমাতে নিবেদন করবার জন্যে আমাদের দেহকোরক উন্মিষিত। তোমার অভিসারে যাবার জন্যে আমাদের সর্ব বৈরী করো উন্মোচিত। তোমার সুখেই আমরা সুখী। তোমার আনন্দেই আমরা আনন্দিত। তোমার তৃপ্তিতেই আমরা পরমতৃপ্ত। তোমাকে আহ্লাদন করাই আমাদের পরম কর্ম। পরম পূজা। আমরা অধীর প্রতীক্ষায় হয়ে থাকবো কপিঞ্জল। তুমি কান্তা হয়ে বিহার করতে আসবে আমাদের কানন-কুন্তলা নিধুবনে। আসবে যমুনা পুলিনে। ছায়াঘন কদম্ব ছায়ে।

এ হলো সার্থক ভাব। রসের সাধন। গোপীরা যে কৃষ্ণের জন। কৃষ্ণের সুখ সম্পাদনের চিন্তায় তারা মন্ময়। তন্ময়। তারা ব'লে খুশী হয়—

'তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।'

লক্ষ্মীর এবারে ব্রজের ভাব। নিমাই যে তার অন্তরতম। প্রিয়তম। তাই পূজো করলে লক্ষ্মী নিমাইয়ের শ্রীচরণ। গলায় পরিয়ে দিলে মালা। মুখে দিলে মিষ্টি। তাকিয়ে রইল আয়ত আঁখিতে নিমাইয়ের স্নিগ্ধ

শুভ্র কান্তির পানে! মনে মনে বললে—তোমাকে আমার সব দিলেম। আমার মন, আমার যৌবন, আমার লাজ, আমার ভয়, সঙ্কোচ সব। হে প্রাণহরণ! বিস্মৃত হয়োনা তোমার লক্ষ্মীকে!

মাথা রাখল লক্ষ্মী নিমাইয়ের পায়ে।

॥ চার ॥

বসে আছেন বনমালী ঘটক।

বসে আছেন অধীর প্রতীক্ষায়।

তা বলে শচীরও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। কি জানি নিমাই আবার কি বলবে। ছোট বেলার খেলার সাথী লক্ষ্মী। তার সাথে বিয়ে! হয়ত হেসেই উড়িয়ে দেবে। হয়ত বলবে, কি বলছ তুমি মা!

বেশ কিছুটা উদ্‌বেগাকুল চিত্তেই শচী গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন নিমাইয়ের কাছে। বললেন, 'ওরে ও নিমু—'

ডাকলে মা?

হ্যাঁ। 'বনমালী এনেছে তোর বিয়ের সম্বন্ধ। মেয়ে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর সঙ্গে তো কত খেলা খেলেছিস ছেলে বেলায়। ওকে বিয়ে করবি?'

শচীর জিজ্ঞাসার মধ্যে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হলো তাঁর মনের ইঙ্গিত। পারলেন না তিনি নিজেকে গোপন রাখতে। নিরপেক্ষ হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু রায় গেল লক্ষ্মীর পক্ষেই।

নিমাই নিশ্চুপ। সুধু তার চাঁদ মুখে চুমু দিলে একফালি হাসি। তাকাল মায়ের মুখের পানে। সারল্যের স্নিগ্ধ মূর্তি। বললে,—আমার কাছে আবার কি জানতে এসেছ। 'তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই আমার ভালো। তা ছাড়া লক্ষ্মীও তো মেয়ে ভালোই।'

একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেল যেন। শচী আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে উঠলেন। তবে আর ভাবনা কি! নিমাইয়ের সম্মতি পেয়েছেন শচী। কথাটা তিনি রাখলেন বনমালীর কানে। আশ্বস্ত হলেন বনমালী। এবারে বিয়ের আয়োজন করো।

আনন্দের বান ডাকল বল্লভাচার্যের ঘরে। পড়ে গেল হুল্লোর। মুখর হয়ে উঠল তাঁর অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ। যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে। মণি কাঞ্চন যোগ। লক্ষ্মী রূপমতী। ঐশ্বর্যময়ী। বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী। পর-ব্যোমের ঐশ্বর্যলীলায় লক্ষ্মী ছিলেন বিষ্ণুর বক্ষবিলাসিনী। এবারে আসবেন ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গিনী হয়ে। এ কি কম কথা? একবারে গোপী বেশ। গোপীভাব।

পূর্ব লীলায় বল্লভাচার্যের কন্যা ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। বাসনায় ব্যাকুল হলো তাঁর চিত্ত। সাধ জাগল অন্তরে।

কি সের?

ব্রজ-বিলাসিনী হ'তে।

তা কেমন করে সম্ভব?

চাই সাধন, স্মরণ ও মনন!

তবে তাই করব আমি। তপে জপে তুষ্ট করব শ্যামকান্তকে।

কঠোর তপস্যায় বসলেন লক্ষ্মী। স্মরণ করলেন কৃষ্ণ-তনু। বরণ করলেন কৃষ্ণ-বিগ্রহ। অন্তর মন অর্পণ করলেন কৃষ্ণ-চিন্তায়।

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে॥'

শ্রীকৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা আছে। অনাদিকালের প্রতিজ্ঞা। কি সে প্রতিজ্ঞা?

যে যেভাবে ভজন করবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সে ভাবে পূর্ণ করবেন তার মনো-বাসনা।

—লক্ষ্মীর মনোবাসনা পূর্ণ হলো। এলেন কৃষ্ণ। এলেন নদীয়ায়। গৌরাঙ্গ বেশে। এলেন লক্ষ্মীও। পূর্ব নামটি রইল। কিন্তু এবারে আর দেবী রূপ নয়, মানবী বেশ। এখানে এসেও সাধন ভজনের বিশ্রান্তি নেই। শৈশব থেকেই লক্ষ্মী গৌরাসক্ত। গৌরগত ভাব। খুশী হলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর। খুশী হলেন লক্ষ্মীর আরাধনায়। গ্রহণ করলেন তাঁকে পত্নীরূপে। বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রী এলেন নদীয়ায়। লাভ করলেন ব্রজেন্দ্রসুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গকে।

সব দুঃখ, সব মালিন্য ঘুচে গেল শচীর। তাঁর সুখের অন্ত নেই। ঘর আলো করা বউ এসেছে। নয়নলোভন রূপ। যে দেখে সে যেন

পারেনা আর চোখ ফেরাতে। সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় ভরপুর শচীর সংসার। এ তো সংসার নয়, রূপান্তরিত হয়েছে স্বর্গে। ঐশ্বর্যময়ী শ্রী এসে মিলিয়েছেন প্রাচুর্যের বাজার। অপার প্রশান্তি শচীর ঘরে বাইরে। তাছাড়া নিমাইয়ের মন জয় করতে পেরেছেন লক্ষ্মী। সে দিক থেকেও শচীর কি কম ভাবনা ছিল? কতদিন কতভাবে চিন্তা করেছেন শচী। ভেবেছেন, তাঁর ছেলে সুখী হলো তো!

রাত। নিঝুম পুরী। স্তব্ধ শান্ত নদীয়া নগরী।

শচী শয্যায় শায়িতা। ঘুম চোখে আসে না। সারাটা দিন অতন্দ্র প্রহরীর মত ছেলে বউএর চলন, বলন করেছেন অবলোকন। শুয়ে শুয়ে তাঁদের কথাই ভাবছিলেন। একটু তন্দ্রা বুঝি এসেছিল। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর নিমাই।

ডাকলেন মধুর কণ্ঠে—মা, ওমা, ঘুমিয়েছ?

আঁত্‌কে ওঠেন শচী—কে, নিমু?

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন শচী। বিস্ময়ে হতবাক প্রায়। তবুও শুধালেন—কি রে!

নিমাই বললে—না, কিছুনা।

চোখ পড়ল শচীর, চোখ পড়ল লক্ষ্মীর পানে। আরও বিস্ময় তাঁর গেল বেড়ে। আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন—একি, বউমাকে নিয়ে যে?

নিমাই মুচকি হাসলেন। প্রবেশ করলেন জননী শচীর ঘরে। সঙ্গে লক্ষ্মী। অপলক নয়নে তাকিয়ে। তাকিয়ে আছেন শচীদেবী তাঁদের পানে।

বললেন গৌরাঙ্গ—আমরা এসেছি তোমার শ্রীচরণ সেবা করতে। আমাদের বঞ্চিত করো না মা!

আনন্দে উদ্‌বেল শচী। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। নির্বাক। নিস্পন্দ। কিন্তু আয়ত আঁখি তাঁর পলকহীন। উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন তিনি। শুনছেন তাঁর নিমাইয়ের কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী—'সর্বতীর্থময়ী তুমি। তোমার সেবা করতে চাই। প্রত্যক্ষ দেবী তুমি। কোথায় যাবো আর তোমায় ফেলে দেবতার সন্ধানে?'

দু'জনে ভাগ করে নিলেন জননীর দুটি পা। শায়িতা জননীর পদ-

সেবায় লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজারী। নারায়ণ কে? যিনি নরের আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। দেবী-ধ্যানে তন্ময় নিমাই। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে করছেন ধর্মাচার। করছেন জননীর পদ-অর্চা। শাস্ত্র-আদেশ পালন করছেন নিমাই। প্রণাম রাখলেন মায়ের চরণে।

শচীর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে এলো। মনে পড়ল জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো। মনে পড়ল স্বামীর কথা।—প্রভু, তুমি কোথায় আছ জানি না। যেখানেই থেকে থাকো, আশীর্বাদ করো তোমার নিমাইকে। আশীর্বাদ করো তোমার নতুন বধূকে। দেখো, চেয়ে দেখো, তোমার অভাগী শচীর আজ কত সুখ। কত তৃপ্তি। কত শান্তি! কত আনন্দ।

এমনি এক আনন্দের তীর্থ সায়রে নেমে এলো মরু-দগ্ধ হাহাকার। নিমাই আদেশ প্রার্থনা করলেন মায়ের কাছে। যাবেন পূর্ববঙ্গে। বললেন —পূর্ববঙ্গ আমার পিতৃভূমি মা। তুমি আশীর্বাদ করো, আমার যেন সেই তীর্থ রজ দর্শনের সৌভাগ্য হয়। সেখানেও তো আমার ঋণ আছে মা।

শুকিয়ে গেল শচীর কণ্ঠ। বুকের মধ্য বিন্দুটায় যেন আছড়ে পড়ল কতগুলো খ্যাপা ঢেউ। কি বলছে নিমাই! এ যে বজ্রদহনের মত মর্মান্তিক। বিয়ে করতে না করতেই বাহির বিশ্ব তাকে ডাকল?

লক্ষ্মী চঞ্চলা। বনহরিণীর মত উৎকর্ণ হয়ে তাকিয়ে। বিভ্রান্ত লক্ষ্মী। মুহূর্তে যেন তার সমস্ত মনটা শূন্য শান্ত হয়ে গেল। দিগন্তে ভেসে উঠল মরুময় বিভীষিকা। বিবক্ষা লক্ষ্মী। কিন্তু কোনও কথাই আসছে না তাঁর মুখে। মৌন-মূর্তিখানা যেন বিধুর বিনতি জানল নীরবে—না, তুমি যেও না!

কয়েক বিন্দু জল পড়ল লক্ষ্মীর নয়ন থেকে। কাপড়ের আঁচলে মুছে নিলেন। সে ক্রন্দনাশ্রু কেউ দেখল না! কেউ জানল না! কেউ পারল না গৌরাঙ্গের পথ রুদ্ধ করতে। যিনি পতিত পাবন—এসেছেন জগৎ জীব উদ্ধার করতে, তার গতিপথ কেই বা আটকে রাখতে পারে?

ছেলের বুকে অনল দহন। পূর্ব বঙ্গ তাঁকে ডাকছে। কাতর কণ্ঠে জানাচ্ছে আহ্বান। করুণ মিনতিতে নিবেদন করছে অন্তরের আর্তি। সেখানে নিমাইকে যেতেই হবে। দিতে হবে যেতে।

কর্তব্যপরায়ণা জননী দেশের ও দশের মুখ চেয়ে দিলেন অনুমতি। অনুমতি দিলেন নিমাইকে।

পথ বন্ধুর। বিপদ সঙ্কুল। নদীর দেশ। জল জঙ্গলে ভরা। কিন্তু কি হবে তাতে? নিমাই যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন মায়ের পায়ে প্রণতি জানিয়ে। যাত্রা করলেন বধূর ললাটে আশিস্ চুম্বন করে।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়িয়ে থাকেন বজ্রে বেঁধে বুক। ঈশ্বর সমীপে কায়মনে জানান প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, ওর যাত্রাপথ সুগম করো! করো বিপদমুক্ত! বিঘ্নহীন।

॥ পাঁচ ॥

তুমি যদি সাগর সমুদ্র—তবে কেন আমার মনে মরুর দহন? তুমি যদি আকাশ নীল—তবে কেন হৃদয় আমার সন্তাপ-সন্তত?

দিন যায়। রাত আসে। বাতায়নের পথে তাকিয়ে থাকেন লক্ষ্মী। নিঝুম নগরীর নিস্তব্ধ পল অনুপলগুলো তাঁর চিন্তাচ্ছন্ন মনটার সঙ্গে তাল ঠুকে চলে। ঘুম আসে না লক্ষ্মীর চোখে। তাকিয়ে থাকেন নক্ষত্র-দীপ্ত আকাশের পানে। তাকিয়ে থাকেন রজনীর স্তব্ধ শান্ত আঁধার সায়রে। আলুলায়িত কুন্তল। মুখে মাখা বেদনার আলিম্পন। বেসে বাহার নেই। নেই কোন আসক্তি। যেন আদিগন্ত শূন্য। কোথাও কিছুর সাড়া নেই। নেই কানাকানি। জানাজানি। মাঝে মাঝে মনের গহনে একটি প্রশ্নের অঙ্কুর উঁকি মারে—কৈ, তুমি তো এলে না?

দিবসে নানা কাজের ফাঁকে কখন যেন মন উন্মনা হয়ে যায়। খেয়াল থাকে না। কি করতে যে কি করে বসেন তা নিজেই বোঝেন না। কোন অতল তলে যেন ডুবে যান লক্ষ্মী। হারিয়ে যায় তাঁর সজীব সত্তা। বিহঙ্গের মত ডানা মেলে সঞ্চরণ করেন নিঃসীম আঁধারে। এক একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে কি যেন কয়ে যায়। লক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। শোনেন সেই বেদনা করুণ বাণী—শূন্য মন্দির মোর!

শচীরও এক ভাব। নিমাইহীন সংসার তাঁর কাছে যেন নির্বাসনের

কারাগার। কত দিন গত হলো। আসবার নামটি নেই ছেলের। বলি, কি লয়ে থাকি, তা কি ও বোঝে না ?

অভিমানী মাতৃ হৃদয়। মাঝে মাঝে বিলাপ করেন। মোছেন আঁখি-নীর। লক্ষ্মীর পানে তাকিয়ে যেন শ্বাস তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসে। এমন ডাগা বউ! কাছে স্বামী নেই। ও দেহ-কুঞ্জের কোরক কুসুমে কার অর্চনা করবে লক্ষ্মী ? সত্যি দুঃসহ। বেদনা করুণ একটা পরিবেশে শচী আর লক্ষ্মী দিন যাপন করতে থাকেন।

ওদিকে পূর্ববঙ্গে ডেকেছে আনন্দের বান। গৌরাঙ্গের আগমন বার্তা বিঘোষিত হয়েছে দিকে দিকে। বিমুগ্ধ পূর্ববঙ্গ বাসী। পেয়েছে তারা, পেয়েছে তাদের মাঝে সোনার মানুষ।

বিদ্যা বিতরণের জন্য এসেছেন নিমাই। এসেছেন পূর্ববঙ্গে। শুধু কি তাই ? নাম সঙ্কীর্তনের প্রচারও এখান থেকেই শুরু।

"এই মতে বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত॥"

তপন মিশ্রের মনে বড় ব্যথা। পদ্মাতীরে তার ঘর। ওখানে বসে তিনি কাঁদেন। চিন্তার আপ্লবে যান ভেসে। কেন ? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পা..ছেন না সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয় করতে। এক দিন তাঁর স্বপ্ন দর্শন হলো। তিনি দেখলেন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলছেন নিমাই পণ্ডিতের কাছে যেতে। তাই করলেন মিশ্র। শরণাপন্ন হলেন নিমাই পণ্ডিতের। বুঝে নিলেন সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। বললেন নিমাই, বললেন তপন মিশ্রকে—বারাণসীতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে জপ কর তারক-ব্রহ্মনাম।

পদ্মা মেঘনার দেশের মানুষ ওরা। মূলধন সারল্য। একদল স্বার্থ সাধক লোকের কবলে পড়ে তারা যাচ্ছিল বিভ্রান্ত হয়ে। নিমাই যেন এলেন এবং জাগ্রত প্রতিবাদ। পতিত আর্ত দীন দুঃখীদের টেনে নিলেন কোলে। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষা কেন্দ্র। জীবদীক্ষার, জীবশিক্ষার এবং জীবমুক্তির অমর মন্ত্র রাখলেন পূর্ববঙ্গবাসীর কানে। নবদ্বীপে নিমাই কেবল বিদ্যারসেই ছিলেন ডুবে। কিন্তু এই উদার ব্যাপ্ত আকাশ নদীর দেশে এসে তাঁর মন নামে মগ্ন হয়ে গেল। তিনি এখান থেকেই প্রথমে শুরু করলেন নাম সঙ্কীর্তন প্রচারের মহাব্রত। মহাযজ্ঞ।

"যাহা যায় তাঁহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্তন।"

এদিকে নদীয়ায় নিমাই নিমাই রব। শচীর ঘরে আনন্দের দীপ নিবু নিবু। বিরহ ব্যথায় লক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা। পাগলিনীর মত হয়েছে তাঁর অবস্থা।

মেঘ জমে আকাশে। আরক্ত হয় আদিগন্ত। বুঝি বা ঝড় উঠবে। উন্মনা লক্ষ্মী। অন্ত নেই উৎকণ্ঠার। বিশুষ্ক কণ্ঠ তাঁর। দুরু দুরু করে হিয়া। লক্ষ্মী শুনেছেন—নদীর দেশ পূর্ববঙ্গ।

তবে কি, তবে কি প্রভু আমার—

আর ভাবতে পারেন না। ত্রস্ত পায়ে ছুটে আসেন শচীদেবীর কাছে। কম্প্র কণ্ঠে শুধান—মেঘ উঠলে নদীতে বুঝি খুব ঝড় জাগে মা?

শচী দেবী আশ্বস্ত করেন বালিকা বধূকে—এমন মেঘে নদীতে কি ঢেউ ওঠে মা!

লক্ষ্মী আশ্বস্ত হন। বসে থাকেন জননী শচীর কাছে। তাঁরও কি কম দুঃখ? নিমাই, নিমাই করে যেন পাগল হয়ে গিয়েছেন শচী।

পুত্র-বিরহে ব্যথিতা জননী। তাঁর মনকে লক্ষ্মী ভুলিয়ে রাখেন নানা ছলে। কিন্তু নিজেকে তাঁর সামলে রাখা দায়। তা বলে বাইরে তার কিছু অভিব্যক্তি নেই। অন্তর দহনের জ্বালায় সোনার অঙ্গ কালো হয়ে যায়। বিরহের বেদনায় বিশুষ্ক হয় তনু। তবু লক্ষ্মী শচীর অতন্দ্র সেবিকা। হাসি আনন্দে তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার কত প্রয়াস। বড় কষ্ট বড় বেদনা! আর যেন সইতে পারছেন না তিনি। আর যেন পারছেন না নিজেকে ধরে রাখতে কাঠিন্যের গুহা গহ্বরে।

কি করে তা সম্ভব? কি করে সইবেন পরব্যোমের ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী ব্রজসুন্দরের বিরহ সন্তাপ? এ বড় কঠোর ব্রত। সুখ, সম্পদ, শান্তিহীনা হয়ে লক্ষ্মীর কান্তি কালো হয়ে গেল। আর সইতে পারছেন না তিনি। সইতে পারছেন না কান্ত প্রেমের বিরহ দহন।

কৃষ্ণকান্তা হলেই কি ব্রজরস আস্বাদন করা যায়?

না।

কেন?

দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামাও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কান্তা। খ্যাত ছিলেন

কৃষ্ণ-মহিষী বলে। কিন্তু সে প্রেম সীমিত। গণ্ডিবদ্ধ। তাতে মিশ্রিত ঐশ্বর্য জ্ঞান !

সৌভাগ্যদায়িনী লক্ষ্মী। বর প্রদায়িনী লক্ষ্মী। ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী লক্ষ্মী। তিনি কেন পারবেন দুঃখের দহনে তিল তিল করে জ্বলে পুরে জীবন রক্ষা করতে? কিন্তু ব্রজপ্রেমে এ দহন সইতে হয়। এ বিরহকে কান্তর পানে তাকিয়ে মেনেও নিতে হয়।

কিন্তু লক্ষ্মী তা পারলেন না। পারলেন না শ্রীরাধার বামাংশ-সম্ভূতা লক্ষ্মী গৌর অদর্শনের বিরহ সইতে। তাঁর মরণ হলো। মরণ হলো সর্পাঘাতে। মুক্ত হলেন লক্ষ্মী। নিলেন বিদায়। বিদায় নিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দরের সংসার থেকে। সর্প হলো নিমিত্ত। মৃত্যু এলো সত্য হয়ে। বিরহরূপ সর্পদংশন তাঁকে মুক্তি দিল।

কি করে লক্ষ্মীকে সাপে কামড়ালো? ঘরে বসেছিলেন লক্ষ্মী। বুঝিবা ভাবছিলেন নিমাইয়ের কথা। এমন সময়ে হঠাৎ এলো এক বিষধর সর্প। দংশন করল লক্ষ্মীর পাদমূলে। সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেল তাঁর। শচীদেবী ডাকলেন ওঝা। কত চেষ্টা। কত যত্ন। কিন্তু বিষ আর নামল না। হতাশ শচী। কাঁদলেন, ডেকে আনলেন প্রতিবেশি-নীদের। চললেন গঙ্গার পারে লক্ষ্মীর মৃতদেহ নিয়ে। তুলসীদামে বিভূষিত করলেন শচী। বিভূষিতা করলেন লক্ষ্মীকে। সুরু হলো নাম কীর্তন। লক্ষ্মী আর চোখ মেললেন না।

কয়েকটা মাস পূর্ববঙ্গে থেকে প্রভু যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন নব-দ্বীপের পথে।

সবে নেমেছে সন্ধ্যা। নদীয়ার আকাশ থেকে পাখীরা ফিরেছে নীড়ে। কর্ম-শ্রান্ত মানুষের মিছিল চলে। মিছিল চলে ঘরের পথে। জ্বলে ওঠে সন্ধ্যা প্রদীপ। হরিনামে ভক্তের অঙ্গন হয় মুখর। নিমাই পণ্ডিত পদার্পণ করলেন নদীয়ায়। সঙ্গে আছে বহু ছাত্র শিষ্য। তারা এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। প্রচুর জিনিষপত্রও নিয়ে এসেছেন নিমাই। এনেছেন বস্ত্রালঙ্কার ও টাকাকড়ি।

ঘরে এলো নিমাই। কিন্তু একি! এ যে বিষাদ সিন্ধু। যেন একটা বেদনার হিমছায়ায় শচীর ঘর অন্ধকারে অবলীন। কোথায় নিমাইয়ের

আগমন বার্তায় জননী এসে দাঁড়াবেন পুত্রের সম্মুখে, তা নয়—যেন শচীর এই মুহূর্তে মৃত্যু হ'লে তিনি বেঁচে যেতেন।

নিমাই ধীরে ধীরে গিয়ে মায়ের পায়ে প্রণাম করলেন। আনত অপ্রসন্ন শচীর মুখ। দু'চোখে অশ্রুর ধারা। বিষণ্ণ বিকেলের মত তিনি যেন নির্বাক স্থাণু হয়ে বসে আছেন।

সব বুঝতে পারলেন পণ্ডিত নিমাই। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কাছে সব দিনের আলোর মত প্রভাস্বর হয়ে উঠল। নিমাই প্রশান্ত কণ্ঠে মাকে বললেন, বুঝেছি মা, তোমার বউমার কিছু অকল্যাণ ঘটেছে,—তাই মুখ তুলে আমার পানে তাকাতে পারছনা তুমি।

রুদ্ধ হৃদয়টা সহসা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল শচীর। মৌন মুখ তবুও হলো না মুখর। কি বলবেন শচী? কি-ই বা আছে বলবার? আবেগ মথিত চিত্ত অন্তরের গহন গভীরে যেন মাথা ঠুকে কাঁদতে থাকে। অশ্রু-স্তিমিত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকেন শচী। তাকিয়ে থাকেন ছেলের পানে।

ওদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল—হ্যাঁ বিশ্বম্ভর তাই। হঠাৎ বউমাকে সাপে কাটল। কত চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কি বলব তোমাকে 'কালই' এসে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল।

একটা বজ্র সম্পাত হলো। মনের সমুদ্রটা আলোড়িত হতে লাগল বারেবার। লক্ষ্মীর শুচিশুভ্র মুখখানা একবার ভেসে উঠল নিমাই পণ্ডিতের মনের আয়নায়। স্তব্ধ শান্ত নিমাই। তাঁর আয়ত আঁখির কোণে বুঝিবা কয়েক বিন্দু জল এসে নীরবে ঝরে পড়ল। নিমাই মুহূর্তেই তা সামলে নিলেন। বললেন মায়ের পানে তাকিয়ে—

"কস্য কে পতি পুত্রাদ্যা
মোহ এব হি কারণম্॥"

কে কার? মোহবন্ধনই সৃষ্টি করে মায়ার। আর সেই মায়ার টানেই জীব হয়ে পড়ে আসক্ত। পতি বলো, পুত্র বলো কেউ-ই কারো নয়।

প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নিমাই, 'দুঃখ করে কি করবে মা! সে তো আর ফিরে আসবে না। তার ভাগ্য ভালো। স্বামীর আগেই হয়েছে গঙ্গা প্রাপ্তি।'

শচীদেবী একবার শিউড়ে উঠলেন। নিমাই চলে এলেন অন্য প্রসঙ্গে।

এ যে লীলাময়েরই লীলা বৈচিত্র্য। নিমাই পূর্ণতম। তাই তো জীবনের একটি সোপানে দাঁড়িয়ে ব্রজরঞ্জন করলেন বৈকুণ্ঠেশ্বরীর মনো-রঞ্জন। পূর্ণ হলো কঠোরতপা লক্ষ্মীর মনোবাসনা। লাভ করলেন ব্রজ তীর্থ। এলেন ব্রজনন্দনের সঙ্গে নদীয়া নগরে। অবসান হলো ঐশ্বর্য লীলার। এবারে মাধুর্যের মোহন মুরতি। তাই নিমাই বিদায় দিলেন লক্ষ্মীকে।

কেন?

ব্রজে নেই বৈকুণ্ঠের অনাবৃত ঐশ্বর্যের প্রকাশ। ঐশ্বর্য এখানে পরিসিঞ্চিত হয় মাধুর্যে। কেবল রস পুষ্টির জন্যেই ব্রজে হয়েছে ঐশ্বর্যের বিকাশ।

বৈকুণ্ঠের খেলা নিমাইয়ের শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি এসে দাঁড়ালেন এবারে ব্রজের পথে। ঐশ্বর্য পুষ্টিসাধন করল মাধুর্যের। শুদ্ধ মাধুর্যময় হয়ে উঠলেন গোরাচাঁদ। নিমাই এবারে ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্যামকান্ত। তাঁর অন্তঃ কৃষ্ণ কিন্তু বহিঃ গৌর। বৈধীর বৈকুণ্ঠ থেকে গোরাচাঁদ চলে এলেন রাগানুগার লীলা কুঞ্জে।

॥ ছয় ॥

নিমাই…নিমাই…নিমাই!

ছোট্ট নাম নিমাই। কিন্তু পরিব্যাপ্তি তার দিগন্তবিস্তৃত। মণ্ডলে মণ্ডলে তাঁর আহ্বান। লোকে লোকে তার আমন্ত্রণ। নিত্যে নিমাই। অনিত্যেও নিমাই। ঐশ্বর্যে নিমাই। মাধুর্যেও নিমাই। নিমাই নেই কোথায়?

ভূলোক থেকে গোলক পর্যন্ত তাঁরই বিস্তার। সবার মুখে নিমাই। সবার বুকে নিমাই। সবার ধ্যানে নিমাই। বৈকুণ্ঠে তিনি বিষ্ণু। গোলকে তিনি কৃষ্ণ। ব্রজে তিনি শ্যাম। নদীয়ায় তিনি নিমাই। জীবমুক্তির মহামন্ত্র এই তিন অক্ষরা নাম—নিমাই।

নদীয়ায় লেগেছে বিজয় উৎসব। নিমাইকে কেন্দ্র করে এক ধ্বনি। এক রব—তুমি অদ্বিতীয়। তুমি অতুলান। তুমি অব্যয়। তুমি অদ্বয়।

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর এসে পায়ে পড়লেন। নিমাইয়ের পায়ে। বললেন, ওগো, তোমায় চিনেছি। জেনেছি। এবারে আমাকে পথ ভাখাও!

কিসের পথ?

তীর্থের পথ! মুক্তির পথ।

তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কেশব কাশ্মীর। দিগ্বিজয়ী। সারাটা ভারতের পণ্ডিত সমাজ নত করেছেন তাঁর কাছে মাথা। এ কি কম কথা? সারদার বরপুত্র কাশ্মীর। এলেন নদীয়ায়। কিন্তু এখানে এসে ঘটল অঘটন। তরুণ পণ্ডিত নিমাই ভেঙ্গে দিলেন তার আজন্মের দম্ভ। কেড়ে নিলেন পাণ্ডিত্যের মিথ্যা অভিমান। পরাজিত হলেন কেশব কাশ্মীর। পরাজিত হলেন নিমাইয়ের কাছে। নদীয়ার মান রাখলেন নিমাই। যশবর্ধন করলেন বাঙলার। তাই তো মুখর জন কণ্ঠ। আনন্দে আত্মহারা। তাদের কণ্ঠ উঠেছে একেবারে গান্ধার থেকে ধৈবতে।

কিন্তু কেশব কাশ্মীরের সংবাদটি কি?

লজ্জায় লাল। দুঃখে মৌন। অভিমানে অশান্ত। গ্লানির ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে তাঁর কান্তি। চোখে নেমেছে অশ্রুজল। মনের বেদনা উথলে ওঠে। স্মরণ করেন তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবী সারদাকে। তন্দ্রা টুটে যায়। রাত কাটে বিনিদ্র। কাশ্মীরের কণ্ঠে অনন্ত আর্তি। অবিশ্রান্ত বিলাপ।

সহসা কি হলো। কেশব কাশ্মীর উৎকর্ণ। বিহ্বল। কান পেতে শুনছেন। শুনছেন দেবী সারদার ললীত কণ্ঠের লহরী—তুমি যার কাছে পরাজিত হয়েছ কাশ্মীর, আমি যে তাঁরই বন্দনা করি। ওঁ যে ঐশী শক্তির আধার। ওঁর কাছে তোমার কি লজ্জা? তোমার মুক্তির সন্ধান ওঁর কাছেই পাবে।

ভোর হলো রোদন ভরা রজনীর। মুছে গেল মালিন্য। গ্লানির আঁধার থেকে কেশব এলেন আনন্দের উদয় তীর্থে। সমস্ত মুখে তার প্রস্ফুরিত হলো প্রশান্তির নির্মলতা। আভূমি প্রণত কেশব কাশ্মীর। লুটিয়ে পড়লেন নিমাইয়ের পদতীর্থে। বুঝিবা অন্তর তখন তার বললে—এই আমার জ্ঞান। এই আমার ধ্যান। এই আমার মোক্ষ। এই আমার মুক্তি।

দু' হাত ধ'রে তুললেন তাঁকে নিমাই। নিয়ে গেলেন নিভৃতে। সব আভরণ কেশবের ক্ষয়ে গেল। হলো তাঁর রূপান্তর। নেমে এলেন অহংকারের চূড়া থেকে সমতলের মৃত্তিকায়।

শুধু কি তাই?

সম্বল করলেন দণ্ডকমণ্ডলু। পরলেন কৌপীন। নেমে এলেন অন্তহীন পথে। অনন্তের অভিসারে।

উনিশ বছরের নিমাই। দন্তহীন। অহংকার শূন্য। মালিন্য মুক্ত। পরম বিনয়ী। অপরূপ রূপ। অপার্থিব সৌন্দর্য। মাথায় ঘন কালো কেশদাম। সরল সিঁথি। পরিধানে পট্টবাস। কনক দীপ্ত প্রশস্ত বক্ষ। প্রলম্বিত শ্বেত-শান্ত উপবীত। বাম হাতে পুঁথি। গলায় উত্তরীয়। আয়ত-শান্ত আঁখি। মুখে মাখা কুসুম-স্নিগ্ধ মাধুরী। জগৎ-প্রতিক্ষ্য।

এমন যার রূপ—তার কাছে বধূ নেই। খাঁ খাঁ ক'রে ওঠে শচীর বক্ষ। চোখে আসে জল। অসার হয়ে যেতে চায় সমস্ত দেহ মন। ঠিক তখন একটি শান্ত স্নিগ্ধ তনু তাঁর মনের নেপথ্যে এসে দাঁড়ায়। শচী অপলক। তাকিয়ে থাকেন মায়া মুগ্ধের মত। তৃপ্তির সুধা সমুদ্রটা যেন উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। সেই মেয়ে। ঘাটের পথে দেখা মেয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া। সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া।

ভুবন মোহিনী রূপ। সৌন্দর্যের আধার। অক্লিষ্ট কান্তি। অপ্রতিম। অদ্বিতীয়া।

কে এই মেয়ে? কি তাঁর পরিচয়?

অসংখ্য তারা আকাশে। কিন্তু সবচেয়ে পরিচিত কোন্‌টি? ধ্রুব। সন্ধ্যা থেকে সকাল, অনন্ত থেকে কল্লান্ত, জীবন থেকে মরণ, সর্বত্র তার অনির্বাণ দীপ্তির অপরিসীম বিস্তার। ধ্রুব নেই কোথায়? বিষ্ণুপ্রিয়া ধ্রুবের মত সত্য।

সত্য নিত্য, অক্ষয়, অশেষ। সত্য অনন্ত, অখণ্ড। যাঁর শেষ নেই, তিনি অশেষ। যাঁর অন্ত নেই, তিনি অনন্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া অশেষ। অনন্ত। নিত্য।

এই কি তাঁর শেষ পরিচয়?

না, আরো আছে। ব্যক্তির পরে আছে ব্যাপ্তির সংবাদ। পৃথুল পৃথিবীর পরে আছে নিত্য ধামের অস্তিত্ব। অবতারের পরে আছে বিরাট মূর্তির প্রকাশ। অংশের পরে আছে অংশিনীর আভাস। রসময়ের পরে আছে রসবল্লভার স্বরূপ।

বিষ্ণুপ্রিয়া অংশ সকলের আশ্রয়। স্বয়ং শক্তি স্বরূপা। মূল কান্তা শক্তি। অংশিনী। রসবল্লভা।

কার রসবল্লভা ?

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বক্ষ-বিলাসিনী হয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ারই অংশ লক্ষ্মী নামে। রামচন্দ্রের পাশে সীতা, তিনিও প্রিয়ারই অংশ। কৃষ্ণ-মহিষী বলে খ্যাত রুক্মিণী, সত্যভামাও প্রিয়ারই অংশ-সম্ভূতা। স্বয়ং স্বরূপে তিনি আবির্ভূতা হলেন ব্রজে রাধা নামে। গোপীশ্রেষ্ঠ রাধা। এবারে আর বিলাস মূর্তি নয়। হয়েছে পূর্ণতমের সঙ্গে পূর্ণতমার উপস্থিতি। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গে এসেছেন ব্রজবিলাসিনী রাই। সেই রাই আবার এলেন। কোথায় ?

নদীয়া নগরে।

কেন ?

স্বয়ং ভগবান এসেছেন। এসেছেন শ্যামকান্ত গৌরাঙ্গ হয়ে।

রাধা না এসে কি পারেন ? তাই তো তিনি এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে বিশ্বম্ভরের আহ্লাদনী হয়ে।

তিনি যে পূর্ণশক্তি। শক্তি আর শক্তিমান বিন্দু প্রভেদ নেই।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥"

একের মধ্যেই দুই। দুই-এর মধ্যেই এক।

শ্রীরাধা ভালো বাসেন নবজলধর রূপ। এ রূপ ছাড়া আর কিছু তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু তিনি দেখলেন 'এক যুবা গৌরবরণ'। মুগ্ধ হলেন শ্রীরাধিকা। কিন্তু এ কি হলো! শেষে অন্য রূপ আমাকে মুগ্ধ করল ? বিহ্বল হলেম। ব্যথার অন্ত নেই শ্রীমতীর। তিনি কাঁদলেন। চোখের জলে নিবেদন করলেন প্রাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণকে—ওগো, আমার এ কি হলো! কি দেখলাম!

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, এ জন্যে কান্না কেন? তুমি যা দেখেছ, ঠিকই দেখেছ। এতে তোমার নিষ্ঠা এতটুকু ভাঙ্গেনি।

কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন শ্রীমতীকে।

কি বুঝিয়ে দিলেন?

ঐ গৌরবরণ যুবাই আমি।

শ্যামবরণ কেন গৌর হলো?

আমি যে তোমার সঙ্গেই মিলিত হয়েছি। তোমার মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। তাই তো বরণ গৌর। কিন্তু অন্তরে শ্যামই। এ যে পূর্ণ শক্তি আর শক্তিমানের অভেদ রূপ।

এ রূপ আবার দর্শন করলেন শ্যামের পরিপূর্ণ আরাধিকা শ্রীরাধাই। সেই রাধাই এবারে বিষ্ণুপ্রিয়া। আর শ্যাম হলেন সেই গৌরবরণ যুবা শ্রীগৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ এলেন নদীয়া লীলায়। সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নাম সনাতন মিশ্র। পাশ্চাত্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বৈদিক। তাঁর পিতা ছিলেন দুর্গাচরণ মিশ্র। সনাতনের পূর্বপুরুষ ছিলেন মিথিলায়। পরে চলে এলেন নদীয়ায়। এলেন দুঃখ-হীন সুখ নিকেতনে। সনাতনের নেই অর্থের কৃচ্ছ্রতা। নেই অজ্ঞানের অন্ধকার। এখানে লক্ষ্মীও আছেন, আছেন সরস্বতীও। দুই শক্তির মিলিত আধার সনাতনের সংসার।

কিন্তু সব থেকেও তাঁর কি যেন নেই। নেই শান্তি। কেন? ছিল একটি ছোট ভাই। নাম কালিদাস। কালিদাস ভবের খেলা শেষ করল। চলে গেল নিত্যধামে। বয়স আর কি-ইবা হয়েছিল? সন্তান সন্ততি বলতে একটি ছেলে হয়েছিল মাত্র। ভ্রাতৃ বিয়োগ! বড় দুঃসহ। বিধুর হয়ে পড়লেন সনাতন মিশ্র।

পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। তাছাড়া, ছোট্ট বউ বিধুমুখী। ওর পানে যেন তাকান যায় না। পরণে শ্বেতবাস। ললাটে নেই এয়োতির চিহ্ন। হাতে নেই শঙ্খ-বলয়। উন্মনা অশান্ত বিধুমুখী। স্বামী বিরহে বিভ্রান্ত! সারা জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছে শুধু ক্রন্দনকে।

সনাতন মিশ্রের পত্নী মহামায়া। চোখ মুছিয়ে দেন বধূর। টেনে আনেন কোলের মধ্যে। স্নেহ দিয়ে, সোহাগ দিয়ে মেয়ের মত বুকে ধরে রাখেন। এ যেন স্নেহের সমুদ্র!

বিষ্ণু-ভক্ত সনাতন। করেন পূজা অর্চনা! যান তন্ময় হয়ে। বিগ্রহের চরণতীর্থে রাখেন অন্তরের অঞ্জলি। শেষ হয় পূজা। বাইরে আসেন। ঢোকেন দেবী-গৃহে। মানে, মায়ের ঘরে।- গর্ভধারিণী জননী বিজয়া দেবী। ইনি কি যে-সে? স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাঁর পায়ে প্রণাম রাখেন। তার পরে দিনের কর্মছন্দের সঙ্গে হন পরিচিত।

স্বামীর একান্ত অনুরক্ত স্ত্রী মহামায়া। স্বামীর ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। স্বামীর সুখ চিন্তনই তাঁর অনুদিনের সাধন ভজন।

যেখানে ইষ্টনিষ্ঠ, সেখানেই করুণার নির্ঝর। যেখানে শুদ্ধ আনন্দ, সেখানেই ঈশ্বরের কৃপা। তাঁর ঐশ্বর্যের প্রকাশ। বিষ্ণুভক্ত সনাতনের ধ্যানে বৈকুণ্ঠ। বৈধীমার্গের সাধক তিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত।

এবারে সংসারী করো। তোমার লীলাঙ্গনে তোমারই দাস হয়ে বিরাজ করা। তোমারই দেয়া মনে চাওয়া পাওয়ার ক্রন্দন।

মহামায়া দেবী হয়েছেন সন্তান-সম্ভবা। শরীর বড় খারাপ চলছে। তাছাড়া, প্রথম সন্তান এই। উৎকণ্ঠার কি অন্ত আছে? দিন রাত এক চিন্তা। এক ভাবনা। কি হবে! না জানি কতই কষ্ট!

মাঘ মাস। শুক্লা পঞ্চমী তিথি।

১৪১৫ শক।

নির্মল আকাশ। বাতাসে বেনুধ্বনি। চতুর্দিকে একটা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। মনে হয় যেন প্রকৃতিও পরেছে শুচী বাস।

সনাতন মিশ্র করছেন ঘরবার। চিন্তাক্লিষ্ট বদন। সজল আঁখি। আনত মস্তক। কি ভাবছেন যেন।

মাঝে মাঝেই উঠছেন শিউড়ে। একটা কান্নার করুণ মীড় এসে তাঁকে বিহ্বল করে দিচ্ছে।

কে কাঁদে?

মহামায়া দেবী।

কেন?

প্রসব-ঘরে গিয়েছেন। হয়েছে বেদনা। ধাত্রী কত বলছেন। দিচ্ছেন প্রবোধ। কিন্তু এ কি প্রবোধে ভুলবার। জীবনের চরমতম বিপদ মুহূর্ত এ যে।

সব কথাগুলো ভেসে আসছে সনাতনের কানে। ঠিক থাকতে পারছেন না তিনি। অস্থির উদ্‌বেল। অশান্ত তাঁর চিত্ত। রিক্ত হয়ে ডাকো। ডাকো বিপদহরণকে। মধুসূদন সর্বসন্তাপ দূর করবেন। সব জ্বালা নিবিয়ে দেবেন। তুলে আনবেন কঠোর থেকে কোমলে। কঠিন থেকে ক্রোড়ে।

তাই করলেন সনাতন। নিরাশ্রয়ের যিনি আশ্রয়। দুঃখের যিনি সান্ত্বনা। বিপদের যিনি উত্তরণ। তাঁর স্মরণ নিলেন তিনি। স্মরণ নিলেন স্বেদে, ক্লেদে। স্মরণ নিলেন অশ্রুতে, আর্তিতে।

এবারে আমি তোমায় নিয়ে থাকি।

॥ সাত ॥

শুধু স্মরণ। মনন। আর চিন্তন।

এই তিন গুণে তাঁকে বাঁধ।

ওরে, তাঁর স্মরণ নিলে তিনি সব আগুন নিবিয়ে দেন। সব বেদনার ঘটান পরিসমাপ্তি।

ভগবান বললেন—আমি ভক্তের যোগ এবং ক্ষেম বহন করি।

স্মরণেই বিস্মরণ। দুঃখের বিস্মরণ হয়। দুঃখের বিস্মরণ হলে কি হয়?

সুখ হেসে ওঠে। চতুর্দিকে প্রস্ফুরিত হয় আনন্দ-মহ সুখ। তখন কি আর কান্না থাকে?

একেবারে হাসির অরুণ দীপ্তি। সোহাগের রজত জ্যোছনা। আনন্দের সাগর-লহর।

সহসা সনাতন মিশ্র উঠলেন আত্‌কে। মুখর হয়ে উঠল তাঁর অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ। হুলুধ্বনি হ'তে লাগল বারে বার।

আলোর কুমারী এসেছে। হুলুধ্বনি দেবে না ?

এক পা দু পা করে সনাতন এগিয়ে গেলেন। দাঁড়ালেন গিয়ে প্রসব-ঘরের সামনে।

কি দেখলেন তিনি ?

দেখলেন রুদ্ধ অন্ধকারের পরপারে একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি। দেখলেন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। মহামায়ার কোলে এসেছেন পরমা শক্তি। মূল স্বরূপা।

আহা কি রূপ ! সনাতন বিহ্বল। বিমূঢ়। এমন রূপ মানবী দেহে সম্ভব ?

সোনার প্রতিমাকে অঙ্কে তুলে নিয়েছেন মহামায়া। এমন অঙ্গে যেন ধুলি না লাগে। তার দেহদ্যুতি বিকিরিত হয়েছে চতুর্দিকে। বারে বারে চুম্বন করতে লাগলেন মহামায়া। চুম্বন করতে লাগলেন সদ্যজাত কন্যাকে। তাঁর সকল যন্ত্রণার হলো অবসান।

ওরে, তোরা শঙ্খ বাজা। জ্বেলে দে ধূপ দীপ মিশ্রর বাড়ির চারিধারে। এতো গৃহ নয়। এযে মন্দির। লীলা-তীর্থ।

চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত। থেকে থেকে যেন আনন্দের শিহরণে দেহ মন শিহরিত। কে, কে এলো এমন অপরূপ রূপ তনু লয়ে সনাতন মিশ্রের ঘরে ?

আনন্দে উদ্বেল সনাতন। তাঁর হৃদয়ের পুলক এসে নয়নে ঝরে পড়ে। অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ। আনন্দের ধারা।

দলে দলে লোক আসে। আসে বিচিত্র বাদ্যের ধ্বনি শুনে। আসে পাড়াপড়শী ত্রস্ত পদপাতে। আসে আনন্দময়ীর দর্শন অভিলাষে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের মিছিল চলে যেন।

ওরা কারা ?

প্রিয়ারই জন। প্রিয়ারই গণ।

জগন্নাথের ঘরে এসেছে গোরা। সনাতনের ঘরে এলো প্রিয়া। এক সঙ্গে গৌর-প্রিয়া।

না এসে উপায় কি ?

প্রিয়া অনুগামিনী হয়েছে গোরার লীলা বিস্তার করতে। এবারে আরও জমাট লীলা। হবে নদীয়ায় মাধুর্যের মহাপ্রকাশ।

॥ আট ॥

আট মাস মেয়ের বয়স।

কথা বলে। কি কথা? বোঝা যায় না। আধো-আধো কথা। আধো-আধো কান্না। হোক, অস্পষ্ট, অব্যক্ত। এ যেন সুধা নির্ঝর। অমিয় মন্থন। এ কাকলি অন্তর আকর্ষণ করে। মনকে ধরে থাকে। ছুঁয়ে থাকে। এ কি শুধুই কথা? না। তবে? এ হলো কৃতনিশ্চয়তার বারতা। মানে, আমি এক সংকল্প নিয়ে এসেছি। সার্থক হয়েছে আমার অবতরণ। সে সংকল্পটি কি? এসেছি কাঁদতে। জীবকে কাঁদাতে। নিজে কেঁদে জগৎ কাঁদাব। ভগবানের জন্যে কাঁদতে শেখাব।

ছোট্ট দুটি পা। তাই দিয়ে আবার হাঁটার প্রয়াস। পারে না। পড়ে যায়। আবার ওঠে। বারে বারে পড়ে, বারে বারে ওঠে। টলমল করে সমস্ত শরীর। প্রসারিত করে দেয় দু খানা বাহু। আমাকে আশ্রয় দাও। কে ধরবে? কেউ নেই। উন্মুক্ত শূন্যতা। নিঃসঙ্গ নগ্নতা। থপ্ করে বসে পড়ে। তখন একটু কাঁদে। অভিমানের কান্না। বিরহের কান্না। ভাবের হাটে ভবের বোঝা বইতে এনেছ। কিন্তু লুকাবে কোথায়? বের করব। কেঁদে কেঁদে খুঁজব। এম্‌নি ওঠা-পড়ার মধ্যে তোমাকে প্রত্যক্ষ করব। তুমি ছাড়া আমি কে? কেউনা। যদি তাই হবে, কেন তবে পাবনা তোমার প্রগাঢ় প্রশান্ত সান্নিধ্য?

আবার উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি। বিশ্রাম নেই। বিরাম নেই। বিশ্রান্তি নেই। এ যেন এক দুঃসহ ব্রত। দুর্দমনীয় অভিযান।

অষ্টম মাসে অন্ন উৎসর্গ। খুব ধুম লাগিয়ে দাও। জানাও নদীয়া নগরীকে আমন্ত্রণ। বিশ্বপরিবারকে দাও বিশ্বময়ীর আগমন সংবাদ। তাই করলেন সনাতন মিশ্র। উৎসব করলেন প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রীতি ও প্রাণ মিলিয়ে। ধনী থেকে দীন এলো। এলো সুখী থেকে দুঃখী। সনাতন তাঁদের সেবা করলেন। সেবা করলেন তৃপ্তিতে, আনন্দে।

করো, তোমরা তৃপ্তিতে শান্তিতে ভোজন করো। দর্শন করো।

এখানে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদন, তেমনি রূপের আকর্ষণ। বিচ্যুতি নেই। বিযুক্তি নেই। আছে এক অখণ্ড, অনন্ত আনন্দ। যত দেখবে তত মাতবে। মনোহরণ কান্তি। নয়নলোভন তৃপ্তি।

মেয়ের রূপে সকলে বিমুগ্ধ। তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। যেন চোখের পলক না পড়লে ভালো হয়!

কি নাম?

বিষ্ণু-ভক্ত সনাতন। মেয়ের নাম রাখেন—বিষ্ণুপ্রিয়া। যেমন বিকচ কুসুম, তেমনি তার নাম-সুরভি। যেমন অথৈ উদধি, তেমনি তার তরঙ্গ রঙ্গ। ও মেয়ে তো আর যে-সে মেয়ে নয়? প্রিয়া পরিবেশন করবে সুন্দরের থালায় আস্বাদ্য ব্যঞ্জন। থালা হলো মন। আর ব্যঞ্জন হলো নাম। নামে রুচি। নামে ভক্তি। নামে প্রীতি। নামে প্রীতি এলেই স্মৃতির দুয়ার খুলে গেল। মানে, আমি কোথায় ছিলাম? কি ছিলাম? আত্ম জিজ্ঞাসা। আত্ম মন্থন। প্রবল মন্থন। মন্থনে মন্থনে 'আমিটি' ডুবে যায়। দাঁড়ায় এসে 'তুমি'। তখন প্রশ্ন করো—কে তুমি?

থাকো জবাবের প্রত্যাশায়। তিনি সব দেখিয়ে দেবেন। জানিয়ে দেবেন। তখন আর বলতে বাধা নেই, দ্বিধা নেই 'আমি তোমারই'।

বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপের বিভায় দিবা দীপ্তি হার মেনেছে। পাড়ার লোকে টেনে নেয় কোলে। করে চুম্বন। সোহাগে জড়িয়ে ধরে। ছেনেপিনে দেয় একশা করে। ওকে কোলে তুললে যেন দেহ মন প্রশান্ত হয়ে যায়। দূর হয় সর্বসন্তাপ। সর্বজ্বালা। রোজ লোক আসে। আসে প্রিয়ার টানে।

বড্ড বিশ্রী লাগে মহামায়ার। এতো ছানাপিনা তাঁর একটুও ভালো লাগে না। তাই কোনোদিন বা রাখেন প্রিয়াকে লুকিয়ে। লুকিয়ে রাখেন অন্দরে। চোখের আ-দেখা করে।

দেখতে দেখতে বিষ্ণুপ্রিয়া বড় হয়ে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে তার অঙ্গ মাধুরী। সাত-আট বছর হয়েছে বয়স। অপূর্ব রূপ। প্রিয়া বিভূষিত হয় নানা অলঙ্কারে। সোনার হাতে পরে সোনার কাকন। পরণে থাকে বর্ণালী বসন। আসে খেলার সাথীরা। তাদের সঙ্গে প্রিয়া মিলিয়ে বসে বাল্যলীলার পসরা। আসে কাঞ্চনা। আসে অমিতা। ওদের সঙ্গে

প্রিয়ার খুব ভাব। খুব সখ্যতা। সব খেলার মধ্যে একটি খেলাকে জীবনগত করে নিয়েছে প্রিয়া। কোন্‌টি? গঙ্গাস্নান। মায়ের সঙ্গে রোজ গঙ্গায় আসে প্রিয়া। করে স্নান। এ যেন তার সাধন-জীবনের একটি ক্রম।

"শিশু হইতে তুই তিন বার গঙ্গা স্নান।
পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বহি নাহি আন॥"

পিতা, মাতার প্রতি প্রিয়ার ভক্তি অচলা। গৃহ বিগ্রহ বিষ্ণু। তাঁকে প্রিয়া ভালোবাসে। ভালোবাসে মনের মতন। প্রাণের মতন।

ভালোবাসা! ভালোবাসাবাসির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সে। কে? যে সব চেয়ে আপন, সব চেয়ে প্রিয়। তাকে ধরতে হবে। ধরতে হবে সেই ভালোবাসার আধারটিকে। বলতে হবে, আমি তোমায় ভালোবাসি। এ কথাটির মধ্যে কি আছে? আছে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ একটি নিবেদন। কি সে নিবেদনটি? মন। আমার মন তোমাকে দিলেম। কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে। মন দিলে আর কি থাকে? দেহ। দেহ তো মনেরই অনুগামী। মনেরই মাধুর্য প্রকাশের ঐশ্বর্য। মন দিলে দেহও সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয়ে যায়। সব না দিলে কি মনের মানুষ আসেন? মনই যে তার কাম্য। মনের মত মন।

বাউল বললে,

"আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কেবল খুঁজি তারে।"

আরও বললে,

"ওরে অন্তরে আয়
ঘুচিয়ে সকল অন্তরায়।"

বিষ্ণুপ্রিয়া এ-বারে অন্তরায় ঘুচাতে এসেছে। দিতে এসেছে প্রাণের পেলবতা। অন্তর-নিষিক্ত নির্যাস। এবারে হবে অনুরাগহীন অন্তরে রাগরসের সঞ্চার। সুধু কি তাই? না। আরও দেবে। কি দেবে? দেবে সেই মনের মানুষটির সন্ধান জানিয়ে। সন্ধান জানাবে লীলা বৈচিত্রীর মধ্য দিয়ে। তাই হয়েছে পূর্ণতমার আবির্ভাব। হয়েছে পূর্ণতমকে নিয়ে। এক এসে দুই।

প্রিয়া এখন বেশ বড় হয়েছেন! কাঞ্চনে, কেয়ূরে ঝলমল করে তাঁর বাহু। কণ্ঠে মণিহার। কর্ণে কুণ্ডল। হাতে কাকন। আপন শোভা সমারোহে প্রিয়া উন্মনা। তন্ময়া। গঙ্গার ঘাটে যান। বসেন গিয়ে জলের ধারে। প্রশান্ত। স্থির জল। তারই মধ্যে ভেসে ওঠে তাঁর অবয়ব। ভেসে ওঠে প্রিয়ার দেহ-মন্দির। আর যেন ঠিক থাকতে পারেন না। ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। বয়ঃ সন্ধির খর প্রবাহে প্রিয়া মুগ্ধা। নিজের রূপে নিজেই বিভোর। তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। হারিয়ে ফেলেছেন নিরাবিল সৌন্দর্যের সরস লোকে। শৈশব যৌবনের দ্বন্দ্বে প্রিয়া মগ্না।

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে দ্বন্দ্বে পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥
অতিথির নয়ন অথির কিছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥"

অনেকক্ষণ পারেন না প্রিয়া তাকিয়ে থাকতে। তাকিয়ে থাকতে পারেন না আপন দেহের নবোদ্‌গত স্তবকের পানে। পুষ্পবনে এ যেন এক নবাগতা। তন্ময়। মন্ময়। যৌবন নিকুঞ্জে কোকিলের কুহু রব। কে যেন বাজায় বাঁশী। কি যেন কয়ে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া বিহ্বলা। উৎকর্ণা—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এতো কভু নহে শ্যামরায়॥
এর গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিলো॥"

প্রিয়ার মনের বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয় কথার কুসুম—হও জন্ম এয়োস্ত্রী। হও দেবপ্রিয়া! বিষ্ণু-প্রিয়া!

শচী বলেছিলেন প্রিয়াকে। শুধু কি প্রিয়াকেই কেবল বলা? না। মহামায়াকেও বলেছেন শচীদেবী। বলেছেন 'ওগো পণ্ডিত-গৃহিনী, তুমি রত্নগর্ভা। ভগবান তোমায় বেশ মেয়েটি দিয়েছেন। বেঁচে থাকুক সুপাত্রের হাতে পড়ুক।'

অধোবদনা প্রিয়া। লজ্জায় লাল। যান দূরে সরে। থাকেন আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে।

মহামায়া বলেন, 'হ্যাঁ গো মা, সেই আশীর্বাদই করুন।'

শচী বলেন, "দেখো, কেমন লজ্জা! কি সুন্দর ভক্তিমাখা মুখ।' দূরে সরে গিয়েছে। ডাকো, ওকে ডাকো তো! ইঙ্গিতে প্রিয়াকে ডাকেন শচী। প্রিয়া এসে দাঁড়ায়। শচীদেবী ছোট্ট একটি চুমো দেন মেয়ের মুখে। মধুর কণ্ঠে বলেন, 'যাবে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে মা?'

আনত মস্তকে প্রিয়া জানান নীরব সম্মতি। বলেন—যাবো!

লজ্জাড়ষ্টা প্রিয়া। ধীরে ধীরে একটি প্রণাম করেন শচীদেবীকে। ধরেন জননী মহামায়ার হাত। যাত্রা করেন বাড়ির পথে।

প্রায়ই দেখা হয় শচীদেবীর সঙ্গে। এমন কথা প্রায়ই হয়ে থাকে। হবে না? গঙ্গার যে একই ঘাটে ওঁদের স্নান হয়। শচী আর মহামায়া একই ঘাটের যাত্রী।

কিন্তু কি করে শচীদেবীকে বিষ্ণুপ্রিয়া চিনলেন? কি করেই বা হলো দুজনে জানাজানি? আর কেনই বা বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীকে দেখলেই নেন পায়ের ধূলো?

এ শ্রদ্ধার অন্তরালে ফুটে নেই কি প্রসন্ন প্রভাতের একটি কুসুম-কলি? আছে। নেই কি এ প্রণতির পেছনে প্রসুপ্ত একটি ঐকান্তিক প্রার্থনা? তাও আছে।

এবারে সেই কলি-কুঞ্জে যেতে হবে। জানতে হবে সে প্রার্থনার মন্ত্রটি কি!

॥ নয় ॥

এই তো সুরধুনী। পূত-সলিলা। লীলাময়ী। কত তরঙ্গ রঙ্গ। কত মান অভিমান। কত না বিরহ বিক্ষোভ!

ভিড় জমেছে স্নানার্থীর। ঘাটে ঘাটে ভিড়। তারা নম্রনত! ভক্তি-শুদ্ধ। এসেছে পূজন ভজন করতে। এসেছে সুরধুনীর তীরে। কিন্তু যাঁর জন্যে কান্না, যার কাছে প্রার্থনা, তিনি কোথায়? কোথায় সেই শরণ-সুন্দর শশাঙ্ক? কোথায় সেই রমন মোহন মূর্তি? তিনি কি নেই? আছেন। এসেছেন এখানে। এই সুরধুনীর পারে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জ্জুনকে। কি বললেন? 'যে ভজন্তিতু মাং ভক্ত্যা ময়ি তেষুচাপ্যহম্।' যারা ভক্তিভরে ভজনা করে আমাকে, তারা যে আমাতেই করে অবস্থান। আমিও সে সকল ভক্তে অবস্থান করি। নদীয়ার ভক্ত দরবারে ভগবান এসেছেন। এসেছেন সুরধুনীর তীর-তীর্থে। কিন্তু ভক্ত হলেই তাকে দেখা যায়? পাওয়া যায়? না। ভক্তের আবার ক্রম আছে। সোপান আছে। তা যদি না অতিক্রম করতে পারো, তবে খুলবেনা মানসচক্ষু। আর মনের চোখ না খোলা হলে দেখাও হবে না প্রিয়তমের সঙ্গে।

কত লোক এসেছে গঙ্গায়। কত নারী, কত নর। কত বধূ, কত বালা। কিন্তু তাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুটি চোখ শুধু অপলক। তিনি দেখছেন। রূপমতীর চোখে পড়েছে রূপময়ের শোভা। এ চোখ ঐকান্তিকতা মেশানো। অনুরাগে অনুলিপ্ত। কিছুতেই ফেরাতে পারছেন না। চোখে চোখে পড়েছে। অমনি যেন মনও ধরেছে গিয়ে মনকে। এখন উপায়? কি লজ্জা! লোকেরা দেখে কি বলবে! বলবে, যুবতীর ধরম নিয়েছে গোরা। মরম নিয়েছে গোরা।

তাতেও যেন সুখ। অনেক কষ্ট করে চোখ নামালেন প্রিয়া। কিন্তু মনটি? মন রইল গোরাগত হয়ে। নয়নে যেন লেগে রইল গোরার রূপ।

বাক্য বিনিময় নয়। হলো ভাবের আদান প্রদান। ভাবের উপরেই লাভ। পরম লাভ। বিষ্ণুপ্রিয়ার মন গোরা চুরি করে নিলেন।

'গোরা রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে সপনে॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিনু গোরা কিনা মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী মোহন॥'

চিত্তচোর প্রিয়ার মন কেড়েছেন! হরণ করেছে প্রাণ।' চার চোখের মিলনে বিষ্ণুপ্রিয়া চোরিত হয়ে গেছে। পড়েছে প্রেমের ফাঁদে। অমন চন্দ্রানন কি বিস্মৃত হওয়া যায়? তাই বিষ্ণুপ্রিয়া মাঝে মাঝে ঘাটের পথে আসেন। নবানুরাগের পরশ বড় জ্বালাময়। বিশ্বম্ভরের গৌরতনু বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুক্ষণের আরাধ্য হয়ে উঠল। তাই তো তিনি প্রণাম করেন গোরা-জননী শচীর পায়ে। মনে মনে বলেন, 'দয়াময়ী মাগো, তোমার পুত্র কি তাঁর চরণে আমাকে ঠাঁই দেবে না? দেবে নাকি তুমি তোমার সেবার অধিকারটুকু আমাকে?'

প্রহরের পর প্রহর হয় গত। বিষ্ণুপ্রিয়ার তদ্‌গত ভাব! কি যেন ভাবেন। কি যেন করেন।

ওদিকে দুঃখের ঢল নেমেছে শচীর ঘরে! লক্ষ্মীকে বিদায় দিয়েছেন নিমাই। শেষ করেছেন তাঁর ঐশ্বর্যের খেলা। মাধুর্যের লীলা পীঠে ঐশ্বর্যের ঠাঁই নেই। থাক্‌লেও তা মাধুর্যের অনুগামী।

শূন্য গৃহ শচীর। মাঝে মাঝে তিনি কাঁদেন। করেন বিলাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নিমাইয়ের পানে তাকিয়ে! খ্যাতিতে, গৌরবে নিমাই নদীয়ার শিরোমণি। রূপে গুণে গোরা গোপীনাথ। কিন্তু এমন যে ছেলে শচীর, তার পাশে বধূ নেই। ভাবতে পারেন না শচী। নিমাইকে বিয়ে করান' একান্ত দরকার। তা না হলে এ ছেলে হয়ত পিঞ্জরের বাঁধন কাটবে। কিন্তু মেয়ে! কোথায় মিলবে নিমাইয়ের মনের মত মেয়ে?

শচীর এমনি এক ভাবনার ভবনে বিষ্ণুপ্রিয়া এসে দাঁড়ান। দেখা হয় আবার। দেখা হয় প্রিয়ার সঙ্গে শচীর গঙ্গার ঘাটে। নীরব প্রণাম! আহা কি মধুর। যেমন নামটি মধুর, তেমনি রূপও মধুর। যেমন শচীর গৌরাঙ্গ, তেমনি মহামায়ার গৌরাঙ্গী। প্রথম দর্শনেই প্রিয়া হরণ করেছিল শচীর মন—

'শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্র যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥'

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সনাতন মিশ্র ধনী। ঐশ্বর্যের অঢেল নিকেতনে তাঁর বসতি। প্রাচুর্যের হাটে প্রিয়া পরিপালিতা। তাছাড়া সনাতন রাজপণ্ডিত। নদীয়ায় তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁরা কি তাঁদের মেয়েকে শচীর ঘরে দিবেন?

কেন দিবেন না?

নিমাই গরীব। অর্থ নেই। ঐশ্বর্য নেই। নেই তার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ। তার উপরে আবার দ্বিতীয় পক্ষ। না, না। এ কিছুতেই হবার নয়। শচীর ভাবনা অলীক। তিনি শুয়ে আছেন স্বপ্ন-শয্যায়।

চিন্তায় ভাবনায় শচী ভেঙ্গে পড়েন। কি উপায় হবে! কেমন করে শচী আনবেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর ঘরে? দুর্ভর একটা যাতনার বোঝা তাঁর কাঁধে। শচীর যেন আর স্বস্তি নেই। জীবনের প্রারম্ভ থেকে অন্তসুপ্তি পর্যন্ত বুঝি একভাবেই কাটবে!

চোখ দুটো আবার আসে অশ্রু-স্তিমিত হয়ে।

ওদিকে সনাতন মিশ্রের চোখেও ঘুম নেই! বড় হয়েছে মেয়ে।

তার এখন বিয়ের ব্যবস্থা তো করতে হয়! কিন্তু বড্ড কষ্টসাধ্য কাজ। সনাতনের অর্থের অভাব নেই বটে। অভাব আছে নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণের। তার 'পরে চাই সু-পাত্র। সু-পণ্ডিত। মহামায়া দেবীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সনাতন করেন আলাপ আলোচনা। আলোচনা করেন বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে!

এদিকে শচী অনেক চিন্তার পরে একটা মতলব করেছেন। কি? কাশীনাথকে বললে তো হয়।

কাশীনাথ কে ?

শচীদেবীর প্রতিবেশী। শুধু প্রতিবেশীই নয়, শচী তাকে দেখেন পুত্রের মত। করেন স্নেহ। ডাকেন বাবা বলে।

"দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ! শুন এক বাণী॥
রাজপণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে তবে করুন কন্যাদান॥"

সব কথা খুলে বললেন শচী। বললেন কাশীনাথ পণ্ডিতের কাছে। বললেন কাশীনাথ—'এজন্যে তুমি ভেবো না মা। এ শুভ কাজের ভার আমার পর ন্যস্ত করে তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি যেমন করেই হোক, সনাতন মিশ্রের কন্যাটি তোমার ঘরে এনে দেবই।'

একটা পাষাণ স্তূপ নেমে গেল। শচীদেবী হলেন কিছুটা চিন্তা-মুক্ত। তবুও শচী অধীরা। তাঁর নিমাইয়ের জন্যে তিনি পাগলপ্রায়। এগিয়ে এলেন ঘটক কাশীনাথের কাছে। বললেন, "বাবা, তুমি এখনই যাও। হাত ধরে গিয়ে আমার নাম ক'রে বলো পণ্ডিতকে, আমার নিমাইকে তাঁর বজায় করতেই হবে।"

দৃঢ়তর উক্তি। কাশীনাথ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তোমার কথাই শিরোধার্য মা।

স্মরণ করলেন কাশীনাথ দুর্গা কৃষ্ণের নাম। হলো পদসঞ্চার! যাত্রা করলেন সনাতনের গৃহাভিমুখে।

সংসারটি সনাতনের ছোট। তবে শচীর চেয়ে বড়। সে যা হোক, ও ঘরে নিমাই জামাই হয়ে গেলে আদরই পাবে। সনাতনের বড় মেয়ে প্রিয়া। ছেলে যাদব। বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই। আর আছে বিধুমুখী ও মাধব। এই তো লোক। মহামায়া তো সংসারে সাম্রাজ্ঞীর বেশে আছেন।

কাশীনাথ এতক্ষণে এসে গেছেন। এসে গেছেন সনাতন মিশ্রের বাড়িতে। পরম সম্ভ্রম ভরে বসবার আসন দিলেন সনাতন। বসলেন কাশীনাথ।

সনাতন বললেন, 'কি ব্যাপার ?'

কাশীনাথ বলেন, 'একটা কথা আছে।'

—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

সনাতন মিশ্রের কপালের চাদরখানায় কয়েকটা চিন্তার রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। কি কথা আবার বলতে এসেছে কাশীনাথ! ক্ষণ বিরতি। কাশীনাথ বলতে থাকেন একান্ত নিষ্ঠা সহকারে, 'তোমার দুহিতাকে দান করো বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের হাতে। যোগ্য পতি। যেমন কৃষ্ণের রুক্মিণী, তেমনি হবে বিশ্বম্ভরের বিষ্ণুপ্রিয়া।'

আনন্দে সনাতনের কণ্ঠ যেন মৌন হয়ে গেছে। এই চিন্তাই তো দিবস রজনী তিনি করেছেন। প্রস্তাবটি দিতে সাহস করেন নি। নদীয়াখ্যাত নিমাই পণ্ডিত। জ্ঞান এবং গুণের আধার। বিশ্ববিমোহন রূপ। তাঁরা কি জন্যে সনাতনের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে নেবেন?

'কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন অন্তর কহি শুন মহাজন॥
এই মোর মনো কথা রজনী দিবস।
প্রকট বদনে কহি নাহিক সাহস॥
আজি শুভ দিন পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইবে গোরাচাঁদ গুননিধি॥
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিলাম তবে।
আপনে যে শচী দেবী আজ্ঞা কৈল যবে॥'

আনন্দে উদ্‌বেল সনাতন মিশ্র। কাশীনাথের পানে তাকান তিনি। তাকান প্রগাঢ় প্রশান্তির দৃষ্টিতে। বলেন গদ গদ কণ্ঠে—এ যে আমার পরম সৌভাগ্য পণ্ডিত! শচী দেবী জানতে পেরেছেন আমার মনের কথা। তাই তোমাকে পাঠিয়েছেন শুভ প্রস্তাব দিয়ে। একবার মহামায়াকে কথাটা বলি, কেমন?

কাশীনাথ অনুমতি দিলেন। সনাতন গেলেন অন্দরে। গেলেন মহামায়ার কাছে। ডাকলেন ব্যাগ্রকণ্ঠে—ওগো শুনছ?

মহামায়া বললেন—কি বলছ?

সনাতন যেন কথা বলতে পারেন না। আনন্দে পুলকে রুদ্ধ হয়ে যেতে চায় তাঁর কণ্ঠ। তবুও তিনি বললেন মহামায়ার কাছে—কাশীনাথকে পাঠিয়েছেন শচী দেবী।

—কেন?

—বিশ্বম্ভরের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তুমি কি বলো?

আনন্দের আপ্লবে মুদিত মহামায়ার নয়নকমল। মনে মনে তিনি প্রণাম জানালেন ভগবানকে। বললেন স্বামীর কাছে—তুমি এখনই যাও। খুশী করে বিদায় দাও ঘটকঠাকুরকে। যত শীঘ্র হয়, বন্দোবস্ত করো শুভ-কার্য সম্পাদনের। ওগো, ভগবান আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার উপযুক্ত বর মিলিয়ে দিয়েছেন।

দুর্লভ এসেছেন সুলভে। নেমেছে আকাশের চাঁদ মাটিতে। বিধাতা! তোমার কৃপা অপরিসীম! বারে বারে প্রণাম করতে থাকেন মহামায়া দেবী। প্রণাম করেন তাঁর আরাধ্য ইষ্টকে।

সনাতন এলেন। এলেন কাশীনাথের কাছে। বললেন মহামায়ার কথা। আর দ্বিধা নেই। দ্বন্দ্ব নেই। নেই বিন্দু ভাবনার অবকাশ। এবারে যত শীগ্‌গির শুভকার্য সুসম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা!

—পণ্ডিত, তুমি গিয়ে বলো, নিমাইয়ের মা অনুগ্রহ করে আমার বিষ্ণুপ্রিয়াকে পায়ে স্থান দিলে আমি ধন্য হবো। কৃতার্থ হবো!

আর ভাবনা নেই। মনের আনন্দ ধরে না ঘটকঠাকুরের। প্রচুর বকৃশিস্ মিলবে। প্রচুর সন্মানী পাবেন কাশীনাথ। এ-পক্ষ ও-পক্ষ, দু-পক্ষেই তার প্রাপ্তি। তাছাড়া কাশীনাথ এ বিয়েকে তার অন্তর দিয়েই সমর্থন করেন।

শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন কাশীনাথ। বললেন শচী দেবীর কাছে। উজ্জল হয়ে ওঠে শচীর মুখ। সনাতন তার প্রস্তাবকে মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়—এ তাঁর পরম সৌভাগ্য বলে কৃতার্থ হয়েছেন তিনি। হবেন না? জহুরী পেয়েছে জহরের খোঁজ। চকোর পেয়েছে চাঁদের সন্ধান। এবারে চলবে আকণ্ঠ সুধা পান। এ সুধা ফুরোয় না। এ ক্ষুধাও মেটে না।

শচী দেবী প্রচার করলেন শুভ সংবাদ। বললেন প্রতিবেশিনীদের

কাছে—ওরে, আমার নিমাইয়ের বিয়ে। সনাতন মিশ্রের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

সন্তোষের সীমা নেই শচীর। তাঁর বক্ষ থেকে নেমে গেছে একটা জগদ্দল পাথর। দুঃখের তিমিরাবসানে দেখা দিয়েছে অরুণোদয়ের সূর্য। আসন্ন প্রভাত। পাখী দিয়ে যায় তার সংবাদ। সংবাদ দিয়ে যায় আকাশে, আত্মায়। মাটিতে, মরমে। কান্না-করুণ শচী আজ হর্ষমতী। আনন্দ শান্ত।

॥ দশ ॥

'তোমার বিয়ের দিন ধার্য করতে যাচ্ছি গো নিমাই পণ্ডিত।' বললেন গণকঠাকুর। নিমাই নির্বাক। বিস্ময়ের কুয়াশায় প্রশ্নের শর বর্ষণ হলো, 'আমার বিয়ে!'

নিমাইয়ের প্রশ্ন শুনে গণকঠাকুর গেলেন তাঁর চেয়েও বিস্মিত হয়ে। বললেন, 'কেন, সনাতন মিশ্রের পরমা রূপবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না?'

একটু নীরব থেকে আবার বললেন গণক, 'বড় সুখের কথা গো! মিশ্রের বড় সৌভাগ্য!'

কি-যে সব বলেন গণক, নিমাই কিছুই বুঝতে পারছেন না। ছাত্ররা আছে সঙ্গে। যাচ্ছিলেন নিমাই স্নান করতে গঙ্গায়। পথে দেখা হয়ে গেল। দেখা হলো গণকঠাকুরের সঙ্গে।

কিন্তু এ কি কথা? বললেন নিমাই, 'কই, আমি কিছু জানি না তো। তা ছাড়া, এ বিয়েতে আমার মতামত নেয় নি কেউ।'

এতক্ষণ ভাবছিলেন গণকঠাকুর, ভাবছিলেন কৌতুক-প্রিয় নিমাইয়ের এও বুঝি কৌতুক। কিন্তু না। এবারে দৃঢ় হইল গণকঠাকুরের মন। সত্যি নিমাই জানে না। তবুও গণকঠাকুর যেন ঠিক ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। তাই বললেন, 'নদীয়ার সবাই এ সংবাদ শুনে করছে আনন্দ, আর তুমি কি না পণ্ডিত তোমার বিয়ের খবরটিই রাখনা! 'এতো

আশ্চর্যের কথা! কেন, তোমার মা-ই যে স্থির করেছেন সম্বন্ধ। তিনিও বলেন নি কিছু তোমাকে?'

'না।'

আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়। নিমাই তাঁর দলবল নিয়ে চলে গেলেন গঙ্গার দিকে।

মহা বিভ্রম। মহা বিস্ময়। তবে আর কি হবে সনাতন মিশ্রের বাড়ি গিয়ে? কি জন্যেই বা দিন দেখতে ডেকেছেন তিনি? যার বিয়ে সে-ই যদি কিছু না জেনে থাকে, তাহলে এ বিয়েই বা হয় কি করে?

অনেক ভাবনা এসে গণকঠাকুরকে যেন বিরত করতে চাইল। কিন্তু তবুও তিনি গেলেন, গেলেন সনাতন মিশ্রের বাড়িতে। যখন ডেকেছেন মিশ্র. তখন যাওয়া তো যাক। দেখি না কি বলেন তিনি।

গণকঠাকুর এলেন মিশ্র সনাতনের বাড়ীতে। সম্ভ্রমে সনাতন দিলেন তাঁকে বসবার আসন। আনন্দ-স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সাম্‌নে।

বললেন গণক, বললেন সব কথা খুলে। সনাতন মিশ্র অপলক। আঁখি স্থির। রুদ্ধ বাক। যেন সমস্ত দেহমন তাঁর নিথর। শান্ত। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। স্তিমিত হয়ে গেল নয়ন দুটি। দাঁড়ালেন সনাতন। কম্পিত পদপাতে এলেন অন্দরে। বললেন মহামায়াকে—ওগো সর্বনাশ হয়েছে!

মহামায়া স্বামীকে বললেন ব্যাকুলকণ্ঠে।—কি বলছ তুমি?

সনাতন বিলাপ করতে লাগলেন—

> নানা দ্রব্য কৈনু আমি নানা অলঙ্কার।
> কাহারে বা দোষ দিব করম আমার॥
> আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
> অকারণে আদর ছাড়িলা গৌর-হরি॥ চৈঃ মঃ।

এত বড় আঘাত! অসহ্য। মহামায়ার নয়নে নামে জলের ধারা। আনন্দমুখর বাড়িটায় নেমে এলো একখানা বিষাদের হিমছায়া। কি

বলে মহামায়া প্রবোধ দেবেন স্বামীকে ? কিই-বা আছে বলার ? বিয়ের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ। এখন নিমাই বলছে—

বুঝিয়া কার্যের গতি কর আচরণ ! চৈঃ মঃ।

না, এ দুঃখের সীমা নেই। এ লজ্জার গুণ্ঠন নেই। নেই এ প্রত্যাখ্যানের সান্ত্বনা। সনাতনের দেহ লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। কাঁদতে লাগলেন হা-হা-কার করে—

হা-হা গোরা চান্দ বলি ভূমিতে পড়িলা।
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ সুখ ধন হারাইলা॥
ফুৎকার করিয়া কান্দে বোলে হরি হরি।
তোমারে না পাইলে বিশ্বম্ভর আমি মরি॥ চৈঃ মঃ।

কাঁদো। কেঁদে কেঁদে দ্রবীভূত কর তাঁর মনকে। টেনে আনো কঠোর কঠিনকে অন্তরের কোমলে। দাও তারপরে অশ্রু ফুলের অর্ঘ্য। পেলব-স্নিগ্ধ অন্তর-চন্দনে অনুলিপ্ত কর তাঁর চরণযুগল। বসাও হৃদয়ের সু-গহনে। অভিষিক্ত কর প্রেমের অশ্রু নির্ঝরে। বলো, হে স্মরণ স্বজন, হে কৃপাকঠোর, দূর কর তোমার নিবাত নিষ্ঠুরতা। পুরণ কর ভক্তের অন্তর তৃষা।

কাঁদো। কেঁদে কেঁদে ডাকো। ডাকো স্বেদে, ক্লেদে, অশ্রুতে, আর্তিতে। যার জীবনে কান্না নেই, জানবে তার অন্তরের প্রেমের অঙ্কুরটিও শুকিয়ে গিয়েছে। কান্না আছে বলেই, কান্নাহরণের স্মরণ চিন্তন। দুঃখ আছে বলেই, সুখ হর্ষের প্রার্থনা। ভালোবাসা আছে বলেই, দ্বৈতের সন্ধান সাধন। তাই জন্মেও কান্না। মৃত্যুতেও কান্না। জন্মে শিশু কাঁদে কেন ?

তোমার অসীমে ছিলাম। ছিলাম তোমার অখণ্ডে একটি 'আমি'হীন অস্তিত্ব নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে। কিন্তু পাঠালে তোমার খণ্ড বিভূতির লীলা-পুলিনে। এলাম মায়া-মর্তে। হলো 'আমিত্বের' জন্ম। তাই তো কান্না—তুমি কোথায় ?

দীর্ঘদিন হলো অতিক্রান্ত। কত ঝড়, কত ব্যথা, কত কান্না জীবনকে করল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। মোহমুগ্ধ মন। তবুও ফিরে তাকায় না অতীত দিনের তীর্থ পানে। কিন্তু একদিন খেলা শেষে শুনতে পেলাম তোমার

পায়ের ধ্বনি। শুনতে পেলাম সেই অন্তর হরণের সুর বাঁশরি। মন মুখ ফিরিয়ে বসল। হলো উৎকর্ণ। চটুল নয়নে সন্ধান করল তোমার। তুমি এলে। দাঁড়ালে এসে এ ঘরের শেষ খেলায় সাথী হয়ে। মন মুগ্ধ হলো। আনন্দে হলো বিভোর। পরিতৃপ্তির পয়োধারায় অভিষিক্ত হলো দুটি নয়ন। অস্ফুটে শুধু বললে—তুমি এসেছ!

জন্মের কান্নাটি বিরহের। কিন্তু মৃত্যুর কান্নাটি হলো মিলনের। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কান্না। শুধু মিলনের কান্না। বিরহের কান্না। কান্না কোথায় নেই? কান্নায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আদিগন্ত।

যদি তাই হয়, তবে আমিও কাঁদব।

কেঁদে কেঁদে ডাকব তোমায়

বলব যতেক মনের কথা

অন্ধকারে প্রদীপ জেলে

চলব তোমার পথে একা।

কিন্তু কার জন্যে কাঁদবে? যাঁকে জামাতা করে আনতে চাইছে। ঘরে তিনি তো যে-সে নন! বললেন মহামায়া, বললেন স্বামীর পানে তাকিয়ে—

স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সে জন কেমনে হইবে তোমার জামাতা।
শান্ত কর মন, স্মর কৃষ্ণের বারতা॥ চৈঃ মঃ।

যেন দৃষ্টি খুলে গেল সনাতনের। মহামায়া করলেন তাঁর চোখ থেকে মায়ার আবরণ উন্মোচন। সনাতনের দৃষ্টির দিগন্তে প্রভাস্বর হয়ে উঠল অনাদি অনন্ত পুরুষের দিব্য তনু। তিনি অন্তর নিষিক্ত অশ্রু-অর্ঘ্যে নিবেদন করলেন প্রাণের কান্না। নিবেদন করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে—

জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভনগরে॥
জয় রুক্মিণীর বাঞ্ছা রক্ষক মুরারি।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা সভারে করিল বিভা জানি তার মর্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্য ধর্ম॥ চৈঃ মঃ।

অবিরল ধারাবর্ষণ। সনাতন মিশ্রের আজ আর কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই। নেই অহংকারের বিন্দু কণাটি তাঁর অন্তরে। জীবনের এই চরম দুঃখের দিনে তিনি স্মরণ করছেন পরম জনকে।

মহামায়া স্বামীর কান্নায় অধীরা। তিনি প্রবোধ দিলেন নানা বাক্যে—'এতে তোমার লজ্জার কিছু নেই গো। বিশ্বম্ভর নিজেই এ বিয়ে করতে নারাজ। নদীয়ার সমাজ ঠিকই বুঝে নেবে, তোমার কোন দোষ নেই।'

কিন্তু সে কথায় কান্না থামে না মিশ্র সনাতনের। থামে না তাঁর ক্রন্দন-বিলাপ। দুঃখাগ্নির হোম-যজ্ঞে সনাতন নিবেদন করছেন ঈশ্বর প্রাপ্তির মন্ত্র—

মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে লৈয়াছ তারিয়া॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজন-ত্রাণ-দাতা।
জয় সর্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥ চৈঃ মঃ।

যাকে কেন্দ্র করে এতো ক্রন্দন কীর্তন, তিনি কোথায়? কোথায় সেই বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া?

এ যে 'অকথন বেয়াধি'। নীরব নিথর বিষ্ণুপ্রিয়া। বসে আছেন একাকী। মন্ময়ে, তন্ময়। গৌর-ধ্যানে প্রিয়া পরাগত। তিনি পরাৎপরের প্রেমে নিমজ্জিত। সহসা একি হলো! অবশ তনু। অপলক আঁখি। নির্বাক। নিস্পন্দ। যেন এক নিশ্চল স্থাণু। আর বুঝি প্রাণ থাকে না প্রিয়ার। ম্লান মুখ। অন্তরে চলেছে ঝড়ের সংক্ষোভ। নয়নে ঝরছে বাঁধনহীন অশ্রু। বিরহিণী প্রিয়ার চোখে বিরহে ক্রন্দন-ঝরণা। কণ্ঠে করুণ কাতরিমা—

'তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥'

প্রিয়ার মন মমতায় বিগলিত। তোমার কাছে কিছু চাই না। শুধু যেন ভালোবাসতে পারি। সেই শক্তিটুকুই শুধু ভিক্ষা। সেই ভক্তিটুকুই শুধু প্রার্থনা। যে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি, তা আর ছিন্ন করতে পারব না। সব সমর্পণ করে দিয়েছি। দিয়েছি মন। দিয়েছি প্রাণ। তার পরে গ্রহণ করেছি মধুর নামটি, গৌর-দাসী। আর কেউ না জানুক, এ-কথা তুমিও জান। আমিও জানি। তাই আজ বলতে দ্বিধা নেই—

'না ঠেলহ ছলে • অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥'

তোমার কি কু-মতি হলো? তুমি আজ চাইছ আমার পূজাকে প্রত্যাখ্যান করতে? যা খুশী তাই কর। আমি বসে রইলেম তোমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে। তুমি বৈ আমার গতি নেই। মতি নেই। তোমাতেই নিবেদন করেছি আমার মন, প্রাণ, যৌবন।

প্রিয়া তদ্‌গত হয়ে বসেছিলেন। অন্তরে চলছিল গৌরবন্দনার মন্ত্র গুঞ্জরণ। বিধুমুখী এসে ডাকলেন—'মা, বিষ্ণুপ্রিয়া।'

নীরব বিষ্ণুপ্রিয়া। মুখে নেই কথাটি। ফিরে তাকালেন বিধুমুখীর পানে। অবাক বিধুমুখী। বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল তাঁর চোখ। বললেন, 'একাকী কেন চুপটি করে বসে আছ? কি হয়েছে তোমার?'

বুঝিবা প্রিয়া মাথা নেড়ে জবাব দিলেন—'কিছু না।'

'তবে? কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?'

—না।

বিধুমুখী প্রিয়ার মুখের কোনও জবাব না পেয়ে চলে এলেন মহামায়ার কাছে। সরলপ্রাণা বিধুমুখী। ছেলে মাধবের চেয়ে তিনি প্রিয়াকে স্নেহ করেন বেশী। কি করে তিনি সহ্য করবেন প্রিয়ার বিরহ বেদন। তাই তো আকুল হয়ে মহামায়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি কিছু বলেছ প্রিয়াকে?

মহামায়া বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই ওকে সকালে একটু বকেছিলাম। বড্ড অভিমানী মেয়ে। যা, ওকে নিয়ে আয় গে।'

বিধুমুখী প্রিয়াকে ডাকতে চললেন। চললেন বেদনাহত অন্তরে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকতে এসেছেন বিধুমুখী।

এসেই অবাক। শুধু অবাক নয়—নির্বাকও বটে। প্রিয়ার পানে তাকিয়ে বিধুমুখীর বাক্যস্ফুরণ হচ্ছে না। কেন?—তুমি এই ছিলে ঘন-নীল মেঘপুঞ্জ। কিন্তু মুহূর্তে রূপান্তরিতা হয়ে গেলে শারদ সকালে? অভাব নেই। অসন্তোষ নেই। নেই কান্না অশান্তির অনুকণাটিও। প্রিয়া পরিবাদিনী। সাতসুরে বেঁধেছেন হৃদ্‌বীণাটি। তার পরে সেধেছেন। হয়েছেন বিজয়িনী। খুঁজে পেয়েছেন ইয়ত্তাহীন আয়তন। বড় খুশী হলেন বিধুমুখী। প্রিয়ার বিষন্ন মুখ তিনি দেখতে পারেন না। বললেন, 'চল, মা ডেকেছেন।'

একফালি কাঁচা রোদ যেন চুমু দিল প্রিয়ার মুখে। মিষ্টি একটুকরো হাসি। তারপরেই আড়ষ্টানত। লাজরক্তিম। আনন্দ-মূক।

কি করে প্রিয়া গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর মার কাছে? ওঁর বুঝি লজ্জা করে না? কেন, লজ্জা কিসের?

নিমাই নিজে পাঠিয়েছেন খবর? খবর পাঠিয়েছেন সনাতন মিশ্রের কাছে। কি খবর? 'মায়ের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। নিছক কৌতুক করেছি গণকঠাকুরের সঙ্গে। মিশ্র যেন মনে কিছু না করেন।'

তার অর্থ কি?

বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠেই পরাব আমি মালা। জন্ম জন্মান্তরে বাঁধনে বেঁধে রাখব তাকে। টেনে নেব এই আনন্দ-উৎসঙ্গে।

তাই বিষ্ণুপ্রিয়া একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু বিধুমুখী ছেড়ে যাবার পাত্রী নয়। তিনি হাত ধরে টেনে তুললেন। নিয়ে চললেন মহামায়া দেবীর কাছে।

ভক্তের অশ্রু হচ্ছে ভগবানকে লেখা তার প্রেমপত্র।

নদীয়া-বিনোদ তার জবাব দিয়েছেন। পূরণ করেছেন ভক্তবাঞ্ছা। তাই তো সনাতনের বাঁড়ীতে আনন্দের সীমা নেই। মহামায়া বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয়াকে। বারে বারে চুম্বন করলেন মেয়েকে। করলেন আশীর্বাদ। তোর সৌভাগ্যেই ফিরে পেয়েছি নিমাই গুণনিধি।

ওদিকে শচীদেবীর ঘরেও আনন্দের কলকল্লোল। নিমাইয়ের বিয়ের দিন তারিখ তিনি নিজেই দেখলেন। ধার্য করলেন শুভদিন শুভমিলন লগ্নের। দু'পক্ষই ব্যস্ত ত্রস্ত। সনাতনের ঘরের প্রদীপ নেবেনা, শচীর ঘরের দীপটিও থাকে অনির্বান। আর কটা দিন? এই তো এসে গেল। তাছাড়া এত বড় বিয়ে। সমস্ত নদীয়া নগরই আনন্দমুখর।

মুকুন্দসঞ্জয় ধনী ব্রাহ্মণ। নিমাই পণ্ডিতের বন্ধু। বললেন, নিমাই পণ্ডিতের বিয়ের সমস্ত খরচ আমার।

কেন?

আমার চণ্ডীমণ্ডপে টোল করেছেন নিমাই পণ্ডিত। অর্জন করেছেন দেশজোড়া খ্যাতি। সুতরাং এ আমারই অধিকার। আমিই বিয়ে দেব তাঁর। বিয়ে দেব মনের মতন করে।

কথাটির প্রতিবাদ করলেন বুদ্ধিমন্ত খান। কে তিনি? কায়স্থ জমিদার। এই কি শুধু তাঁর পরিচয়? না। তবে? ছিলেন তিনি গুণবান। শিল্পানুরাগীও বটে। সংস্কৃত গ্রন্থ 'বল্লাল চরিত' প্রণেতা শ্রীমৎ আনন্দভট্ট ছিলেন বুদ্ধিমন্তের সভাপণ্ডিত। আনন্দভট্ট লিখেছেন উক্ত গ্রন্থে, বুদ্ধিমন্ত ছিলেন নদীয়ার রাজা। শুধু তাই নয়—নিমাই পণ্ডিতের একজন অনুরাগী ভক্ত।

বুদ্ধিমন্ত বললেন, 'একি যেমন তেমন বিয়ে? না—যার-তার একটা বিয়ে? হোক নিমাই বামুনের ছেলে, কিন্তু তা বলে এ 'বামুনে বিয়ে' নয়। রাজার ছেলের মত করে বিয়ে দেব নিমাই পণ্ডিতের। ডাক লাগিয়ে দেব সমস্ত নদীয়াবাসীকে। এ বিয়েতে যা খরচ লাগবে, সব আমার।'

তা বেশ তো। বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে মুকুন্দসঞ্জয়। কিন্তু মুকুন্দ-সঞ্জয়কে খরচা করতে দিতে বাধা কি? অঢেল অর্থ ব্যয় করুন বুদ্ধিমন্ত। মুকুন্দসঞ্জয়ও সেজন্য বিরত হবেন না। তাই বললেন তিনি বুদ্ধিমন্তকে, 'আমিও কিছু বহন করি-না কেন?'

ভালো কথা। তবে একসঙ্গেই আসুন, করি উৎসবের আয়োজন। লোকে দেখুক, জানুক, যে একটা বিয়ে হচ্ছে বটে। ভুবনমোহন যার রূপ, তার বিয়েতেও চাই বিশ্ববিদিত খ্যাতি। ওঁরা একসঙ্গে লেগে গেলেন কাজে।

শুধু পরিকল্পনা নয়—বাস্তবেও করলেন তাই।

আজ শুভ অধিবাস দিবস। লোকে লোকারণ্য শচীর গৃহ। কুল-ললনাগণ পরিশোভিত হয়েছে বস্ত্রালঙ্কারে। তারা দল বেঁধে দেখতে এসেছে নিমাই চাঁদকে। দেবপূজায় নিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। পড়ছেন তাঁরা বেদ। আলোয় ঝলমল করছে প্রাঙ্গণ। চতুর্দিকে টানিয়ে দেয়া হয়েছে বড় বড় চন্দ্রাতপ। তারই নীচে অভ্যাগতদের উপবেশন আসন। চন্দ্রাতপের চারিধারে রোপিত হয়েছে কদলীতরু। তার নীচে পূর্ণঘট! ওপরে আম্রপল্লব। আলপনায় সুসজ্জিত হয়েছে সমতল। অধীর প্রতীক্ষায় মঙ্গল মুহূর্তটির প্রার্থনায় সকলে তন্ময়। সায়াহ্নে উদ্‌যাপিত হবে শুভ অধিবাস উৎসব।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব সজ্জন সবাইকে করা হয়েছে নিমন্ত্রণ। ধীরে ধীরে এলো অপরাহ্ণ। এলো বাদ্যকরগণ। বেজে উঠল মৃদঙ্গ। বাজল সানাঞি, জয়ঢাক ও করতাল। শচীদেবীর বাড়িটি হয়ে উঠল উৎসব-মুখর। বারে বারে শঙ্খধ্বনির মধ্যে ভাটগণ পাঠ করতে লাগল 'রায়বার'। নারীগণ দিল হুলুধ্বনি। ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে লাগ:লন বেদমন্ত্র। পণ্ডিতগণ পরিগ্রহ করলেন তাদের যথানির্দিষ্ট আসন। সকলের মধ্যে এসে বসলেন নদীয়া-জীবন গৌরাঙ্গ সুন্দর। সুরু হলো ব্রাহ্মণগণকে সুগন্ধক, চন্দন, তাম্বুল ও মাল্যদান পর্ব! আনন্দে মত্ত সকলে। অগুণতি লোক। আসতে লাগল তারা বারে বারে। কেই-বা কাকে চিনবে? বারে বারে এসে গ্রহণ করতে লাগল তাম্বুল ও মাল্য। ঠিক তখন এসে অধিবাস নিয়ে উপস্থিত হলেন সনাতন মিশ্র। সত্যই এ এক রাজোচিত ব্যাপার যেন। সকলেই মুগ্ধ হলেন অধিবাসের দ্রব্যাদি দেখে।

সনাতন মিশ্র চলে এলেন বাড়িতে। সুসম্পন্ন করলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভ অধিবাস। বাজল মঙ্গল শঙ্খ। বাদ্যধ্বনির মধ্যে কুলবধূগণ বারেবার

দিতে লাগলেন হুলুধ্বনি। রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু কে কার অলঙ্কার। যেন মনে হলো প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শেই প্রদীপ্ত হয়েছে কনক-কাঞ্চন। নতমুখে বিষ্ণুপ্রিয়া বসে আছেন। তাঁর চতুর্দিকে নদীয়ার ললনামণ্ডলী।

ওদিকে মহামায়ার বিরাম নেই। তিনি অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করছেন। পরিতুষ্টিসাধন করছেন তাদের। এইমাত্র সনাতন দেবপূজা সমাপন করলেন। করলেন পিতৃপূজা। বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিবাসও সুসম্পন্ন করলেন সনাতন মহাসমারোহের মধ্যে।

আপনে আপনে কন্যা অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন অলঙ্কারে॥
দেবপূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি।
অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি॥
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ॥ চৈঃ মঃ

দুঃখের আগল ভেদ করে প্রকীর্ণ হয়েছে সূর্য। সনাতনের মুখ আজ উজ্জ্বল। মহামায়ার আনন্দের পরিসীমা নেই। বেদনাহত চিত্ত তাঁর বিত্তময়ের আগমন বার্তায় মধুময় হয়েছে। আর ভাবনা নাই। সাঙ্গ হয়েছে ছেলে ও মেয়ের মঙ্গল অধিবাস। এবারে মিলন পর্ব। বিষ্ণুপ্রিয়া হবেন এবার গৌরাঙ্গবিলাসিনী। এবারে অনন্ত রসবল্লভার সঙ্গে মিলন হবে অখণ্ডরসস্বরূপের।

॥ এগারো ॥

ভোরের পাখী ডাকে।

পূর্ব দিগন্তে পড়ে আলোর আলপনা। ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে। উল্লোলা গঙ্গা! নিমাই ফিরছেন ঘর পানে। ফিরছেন গঙ্গা স্নান করে। ঢুকলেন মন্দিরে। মন মগ্ন হলো বিষ্ণু-আরাধনায়। এ তাঁর নিত্যকারের কর্ম।

শচীদেবীও ব্যস্ত। তিনিও যাচ্ছেন গঙ্গায়। যাচ্ছেন ষষ্ঠীর আর গঙ্গার পূজো করতে। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে নরনারী। যাচ্ছে বালক বালিকা। সব শেষে শচীদেবী পালন করবেন লোকাচার, দেশাচার। সকলের হাত ভ'রে শচী দেবেন খৈ, কলা। দেবেন তেল, সিঁদুর, পান। ব্রাহ্মণদের দান করবেন ভোজ্য ও বস্ত্র। অপরাহ্ণে হবে নিমাইয়ের বিয়ের স্নান।

একে একে সব কাজ সমাধা হয়ে গেল। শেষ হয়েছে নিমাইয়ের বিষ্ণু-পূজো। বেলাও হয়েছে ঢের। এখনও বিয়ের স্নান বাকী। শচীদেবী ডাকলেন মেয়েদের। এলো এয়োতির দল। বসল নিমাইকে ঘিরে। এ যেন চাঁদের চারিধারে চকোরের পরিবেষ্টন। সুরু হলো আনন্দকাকলি। নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জন করছে নদীয়ার নারীগণ। দাঁড়িয়েছে এ সে এক দিব্য আনন্দ মাধুরীর মোহনায়।

উনমত নারীগণ করে অভিষেক।
পুরুষের মনঃ কথা করে পরতেখ॥
অঙ্গ ঠেলি পড়ে কেহো গঙ্গা জল ঢালে।
জয় জয় হুলা হুলি সু-মঙ্গল রোলে॥ চৈঃ মঃ

নিমাইয়ের অঙ্গ অর্চার অমোঘ আনন্দে পুলকপ্রাণ নারীগণ। তাদের দেহ দুলছে। মন ফুলছে। এ যেন অফুরন্ত অতুলান সুধা। শেষ নাই। নিবৃত্তি নেই। নেই নিরোধ। যতো খুশী পান কর। আকণ্ঠ ডুবে থাকো অমৃত সমুদ্রে। পূর্ণ করে নেও জীবনের পেয়ালা।

ওরা হারিয়ে গেল। নিমাইয়ের রূপ-মাধুরীতে জুড়িয়ে গেল তাদের দেহ-দাহ। নিমাইয়ের অঙ্গস্পর্শে ওদের অঙ্গে ও অন্তরে নেমে এলো, নেমে এলো এক অচঞ্চল আনন্দরস। বিভোর তারা। তন্ময় হয়ে গিয়েছে গোরা-রূপ দর্শনে। মন্ময় হয়ে উঠেছে গোরা-অঙ্গ পরশনে।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব? যার শরদৃষ্টিতে মদন হলো মূর্ছিত—তাঁর দেহস্পর্শে নারীগণ থাকে কেমন করে অবিচল? কেন বা পারবে না? ওদের যে অন্যভাব। এসেছে এক শুদ্ধ স্নিগ্ধ প্রেমের অঙ্গনে। তাই তো নিমাইয়ের অঙ্গস্পর্শে ওদের কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে। এতে বাসনার দংশন নেই। নেই কামনার ক্লিষ্ট আর্তি। তবে কি আছে?

আছে অপার আনন্দ। এ আনন্দ আত্মতৃপ্তির আনন্দ নয়। প্রাণবল্লভের তুষ্টি সাধনের আনন্দ।

তাই তো নারীগণ মত্ত। সজীব সত্তা তাদের বিলুপ্ত হয়েছে। নিমাইয়ের অভিষেক করছে তারা। করছে সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে। অন্তর যেন নিরন্তর বলছে—তোমাকে দেখার সাধ মেটে না। যত দেখি তত মাতি। যত ক্ষুধা তত সুধা। যত কান্না তত কাব্য। তুমি মধুর। তুমি সুন্দর। তুমি অসীম হয়ে এলে আমাদের সন্তোষে। তুমি মুক্ত হয়েও যুক্ত হলে। আমাদের ডুবিয়ে রাখো। ডুবিয়ে রাখো তোমার রূপসাগরে অরূপ অতলে। তোমার কাছে কিছু চাই না। তবুও তোমাকে ভালোবাসি। তোমার কাছে কোনও দাবী নেই। তবুও তোমাকে না দেখে পারি না। এই না-পারাটুকু, এই ভালোবাসাটুকুর মধ্যে যদি বিন্দুও কামনার অঙ্কুরটি লুকিয়ে থাকে ; তবে তা ধুয়ে নিও তোমার করুণার স্বচ্ছ ধারায়। তোমার তনুভায় আমরা তন্ময়। বিভোর।

সহজ প্রাণের প্রবাহে চলল নিমাইয়ের নদীয়া-লীলা। বলি, ওরা কি যে-সে? ওরা যে বিষ্ণুপ্রিয়ারই বিলাস মূর্তি। নিমাইকে সুখ দান করা মানে কি? গোপীতমা বিষ্ণুপ্রিয়াকেই খুশী করা। তাঁকেই পরিতৃপ্ত করা।

এ যেন ব্রজ-রঙ্গ নিকেতন। ওরা যেন ব্রজ-গোপী। নদীয়ায় মিলিয়ে বসেছে আনন্দের বৃন্দাবন।

কেউ মাখছে সোনার অঙ্গে তেল, হরিদ্রা, আমলকি। কেউ বা করছে তার কেশ বিন্যাস। কেউ ধরে বসে আছে নিমাইয়ের চরণযুগল। তাতে হলো অভিমান আর একদলের। বলেই ফেললে ওদের মধ্যে থেকে কে যেন, "কেন ঐ শিববিরিঞ্চি বন্দিত পদসেবা তুই একাই করবি?"

জোর করে টেনে আনে। টেনে আনে গৌরসুন্দরের চরণযুগল। ধরে রাখে বক্ষে। একেবারে মঙ্গলকুম্ভের সন্ধি মোহনায়। মন যেন বলে ওঠে—এই পথে পা ফেলে তুমি এসো। এসো আমার অন্তর মন্দিরে।

বলবে না কেন?

এ চরণযুগলের যে অপার মহিমা। অনন্ত শক্তি। ওখানে জীবনের সব মেলে। মেলে শান্তি তৃপ্তি। মেলে আনন্দ হর্ষ। সব-কিছুর আধার নিমাইয়ের চরণতীর্থ। শুধু তাই নয়। এ চরণ পেতে হলে চাই জন্ম-জন্মান্তের সাধন মনন। চাই তপ তিতিক্ষা। কোটি কোটি যুগের তপোধ্যানে এ চরণ-দীপ্তির দর্শন লাভ করে সাধক। হয় ধন্য, মুক্ত ও সিদ্ধ। এমন মধুভাণ্ড পেয়েছে নদীয়ার নারীগণ। তা কি কেউ ছেড়ে আসতে চায়! তাই তো ওরা মত্ত। মত্ত মধুপের মত! পান করছে আকণ্ঠ গোরা-চরণের মকরন্দ।

ওদিকে শচীদেবী ডাকলেন এক ব্রাহ্মণকে। বললেন তার হাতে তেল হলুদ দিয়ে—যাও শীগ্‌গির সনাতন মিশ্রের বাড়িতে। এ তেল হরিদ্রা না পৌছলে মেয়ের যে স্নানই হবে না।

সেখানেও মহাসমারোহ। সমাপ্ত হলো গাত্র-হরিদ্রার শুভপর্ব। বেলাও পড়ে এলো। বরবেশে সজ্জিত হচ্ছেন নিমাই। বেশকারীবৃন্দ ব্যস্ত। তারা মনের মত করে সাজিয়ে দিচ্ছেন নিমাইকে। বুদ্ধিমন্তের কড়া হুকুম—একেবারে রাজবেশ চাই!

করলও তাই। নিমাইয়ের চন্দ্রাননে ফুটে উঠেছে অন্তরের অতুলান মাধুরী। চাচর কেশ। অপূর্ব তাঁর বিন্যাস। তাতে পরিশোভিত মুকুট। কর্ণে কুণ্ডল। কণ্ঠে শোভাময় হয়ে আছে মতির মাল্য। বাহুতে বাজুবন্ধ। পরণে পীত বসন। সারা অঙ্গে ঝলমল করছে রেশমী পোষাক! তাতে আবার চুণী পান্নার বিচিত্র কারুকর্ম। দিব্য গন্ধে সোনার অঙ্গ ভরপুর। এমন রূপ ভুবনে কখনো দেখেনি কেউ। মন এ রূপ দর্শনে হয় উন্মনা। নয়নে লাগে নেশা। সব ভুলে যেন ঐ রূপতনুর অথৈ আনন্দে ডুবে থাকতে পারলে অনেক শান্তি। অনেক তৃপ্তি। নদীয়া-বিনোদ যাবেন রাজবেশে। যাবেন বিনোদিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনতে।

সন্ধ্যা নামে নামে। শেষ বেলাকার গান গেয়ে পাখীরা ফিরে গেল। লোকে লোকারণ্য। বললে সবাই—'ছেলেকে এখনই যাত্রা করিয়ে দাও।'

কেন ? বিয়ে তো গোধূলিতে !

প্রহরেক সর্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া ।
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥
তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান ।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥ চৈঃ ভাঃ

তবে তাই হোক। বুদ্ধিমন্ত খানের হুকুমে এলো রাজোচিত দোলা। নিমাই মাকে করলেন প্রদক্ষিণ। রাখলে তাঁর শ্রীচরণতীর্থে ভক্তি বিনম্র একটি প্রণাম। নমস্কার করলেন সমাগত বিপ্রগণকে। বেজে উঠল শঙ্খ। পড়ল হুলুধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বাদ্যকরদের বিচিত্র বাজনা। উত্থিত হলো জয়ধ্বনি। বিঘোষিত হলো বরযাত্রার মঙ্গল লগ্ন।

দোলায় আরোহণ করলেন নিমাইচাঁদ।

॥ বারো ॥

নীল দিগন্তে চাঁদ উঠেছে।

নেমেছে রজত জ্যোছনার ঢল। পাখী ডাকে। ডাকে কোকিল কুহু কুহু। ওরাও আজ আনন্দমুখর। সুরধুনী থেকে ভেসে আসছে মলয় অনিল। এ রাত, রাত নয়। ধারণ করছে রূপসী তন্বীর রূপ। এ এক অচিন্তিত আনন্দ-প্রকাশ !

ধীরে নামে গোধূলি। পড়ে যায় একটা আনন্দের সাড়া। কোলাহলের মধ্য থেকে স্পষ্ট ধ্বনিত হয়ে ওঠে তাঁর আগমন বার্তা—ওরে, বর এসেছে রে ! বর এসেছে !

ছুটে এলেন সনাতন মিশ্র। দাঁড়ালেন দোলার সামনে। কিন্তু কি দেখছেন তিনি ? আঁখি অপলক। অন্তরে উত্থিত হয়েছে দেব-বন্দনার মন্ত্র। কণ্ঠে জড়িমা। সনাতন যেন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন আপন পরিচয়। আপন ব্যক্তিত্ব। বারে বারে তাঁর অন্তর মন্থন হয়ে একটি প্রশ্নই উঁকি দিতে থাকে—কে তুমি ?

ভালো করে তাকাও। চোখ রাখো ভ্রূ-সন্ধিতে। মনকে পাঠিয়ে

দাও হৃদয়ের অতল গভীরে। তারপরে দেখো। দেখো অন্তর-দৃষ্টির দিব্য আলোকে, তোমার সম্মুখে কে! জীবনের যৌবন থেকে শুরু করে যাঁকে ডেকেছ। করেছ যার ধ্যান, মনন ও সাধন দিবস সর্বরী। তিনি তোমারই ডাকে, তোমারই প্রেম-নিষ্ঠায় হয়েছেন এসে হাজির। দেখা দিয়েছেন তোমাকে তাঁর স্ব-রূপে। স্ব-বেশে।

ভাবে আপ্লুত সনাতন। ভেসে যাচ্ছেন ভক্তির আপ্লবে। গৌরাঙ্গের চরণ-রজ মস্তকে ধারণ করতে ইচ্ছে হলো সনাতনের। তিনি ধ্যান-স্নিগ্ধ অন্তরে শ্লথ পদপাতে এগিয়ে এলেন।

গৌরাঙ্গ সব বুঝে নিলেন। জাগিয়ে দিলেন সনাতনের মনে লৌকিক ভাব। কিন্তু কি হবে তাতে? নদী মরলেও শুকোয়না তার ক্ষীণ স্রোতটি। সনাতন জড়িয়ে ধরলেন নিমাইকে বক্ষে। নিলেন কোলে তুলে।

সকলে বিস্মিত! বিহ্বল। দেখছে তারা ভক্ত ভগবানের মিলন মাধুর্য। গৌরাঙ্গ নির্বাক। মুখ নিচু করে আছেন। রসময় রসাস্বাদে মগ্ন। কি করে তাকাবেন তিনি?

সনাতন মিশ্র বসালেন এনে নিমাই চাঁদকে বরসভায়। নিজেও রইলেন বসে। বসে রইলেন গৌর-অঙ্গ স্পর্শ করে। সবাইকে বলতে লাগলেন ডেকে হেঁকে, 'ওরে, এই যে বর। আমি দোলা থেকে কোলে তুলে এনেছি। তোরা বরণ কর।'

মহামায়া এলেন ধানদূর্বা নিয়ে। আশীর্বাদ করবেন নিমাইকে। জামাতার পানে চোখ পড়তেই থম্‌কে গেলেন। সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। থর থর করে কেঁপে উঠল মহামায়ার হাত। তাঁর মনেও প্রশ্নের প্রভঞ্জন—এ কে, নর, না নারায়ণ?

অনেক কষ্টে নিমাইকে আশীর্বাদ করলেন মহামায়া। জ্বালাও সপ্ত প্রদীপ। দাও তাতে ঘৃতের ব্যঞ্জন। আরতি করো। আরতি করো দেব-মন্দিরে। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রিয় স্নিগ্ধ শিখাটি জ্বালিয়ে করো নিরাজনা।

তাই করল সকলে মিলে। নিমাইকে বরণ করল তারা। বরণ করল কমণীয় মাধুর্যে।

মুখচন্দ্রিকার শুভলগন সমাগত। নিয়ে এসো চন্দ্রাননাকে উদয়ভানুর নয়নবাণে। উপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়া। নিয়ে এলো তাঁকে। প্রদক্ষিণ করলেন তিনি, প্রদক্ষিণ করলেন গৌরগুণমনিকে। একবার নয়, দুবার নয়— সাতবার। সপ্তপাকে সপ্তলোকাধিপতিকে বরণ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। করলেন পুষ্পবর্ষণ। দিলেন পরিয়ে দৈতের কণ্ঠের মালা। এই তো আত্মনিবেদন! আত্মসমর্পণ! এমনি করেই বরণ করতে হয় বরণীয়কে।

গৌরাঙ্গের অধরে জ্যোছনার স্নিগ্ধতা। তাকালেন আয়ত আঁখি পানে। তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। এ যেন রাত্রির বৃন্তে একটি সুনির্মল পারিজাত। কান্তার কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিলেন নিমাই। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বড্ড লজ্জাশীলা। পারছেন না চোখে চোখ মেলাতে। প্রিয়ার সখীরা ঝলসে ওঠে—'ওকি হচ্ছে? নয়ন মেলে তাকাও। শুভ-দৃষ্টির সময় চার চোখের মিলন করতে হয় যে।'

কেমন করে তাকাবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। মনে পড়ে অতীত। দৃষ্টির দিগন্তে ভেসে ওঠে সুরধুনী। এই চপল নয়ন-শরই তো বিদ্ধ করেছিল প্রিয়ার প্রাণ। অধীর প্রিয়ার মন সেদিন কি বারে বারে বলেনি—

'আমার সাধন হল সারা
আমার ভজন হল সারা
গৌরাঙ্গের কান্তা আমি।
কান্ত আমার গোরা?'

সেই পরমক্ষণেই হয়েছিল মরম বিনিময়। হয়েছিল শুভ দর্শন। সাক্ষী রয়েছেন সুরধুনী। তাই তো আজ দূরের প্রেমকে কাছে পেয়ে প্রিয়ার মনে লাজের সঞ্চার হয়েছে। এসেছে আড়ষ্টতা। কিন্তু এ বড় মধুর। নম্রনতা প্রিয়া। কিন্তু হিয়া তার উন্মুখ!

রূপসীর রূপের আভায় বিভাবরী হয়েছে আলোকিত। কেনই বা হবে না? যেমন বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গশোভা, তেম্নি সনাতনের অকৃপণ সজ্জা-সামগ্রী।

পণ্ডিত শ্রীসনাতন হোতা নিজ ঘরে।
নিজ কন্যা ভূষা কৈল নানা অলঙ্কারে॥

গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ ছটায় আলো করে দেশ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখবাণ সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা ॥
ফণধর জিনি বেণী মুনি মন মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে ॥ চৈঃ মঃ।

শ্যামাঙ্গীর অঙ্গবিভায় চোখ যায় ঝলসে। এ যেন একই রূপ। একই কান্তি। একই দেহ। বিশ্বম্ভর আর বিষ্ণুপ্রিয়া। বিন্দু প্রভেদ নেই। কেবল লীলা বিলাস হেতু দুই রূপ। দুই তনু।

বাসসজ্জায় সজ্জিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। যাচ্ছেন বাসর ঘরে। আনন্দ-বিবশতনু। অধীর অন্তর। অ-থির পদপাত। যেন পা তুলে চলতে পারছেন না। সমস্ত দেহ-মন যেন প্রেমে জর জর। স্বেদে সিক্ত। সহসা শিঞ্জিনীর ধ্বনি হলো। চম্‌কে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দাঁড়ান থমকে। পায়ে আঘাত লেগেছে। অস্ফুট ধ্বনি হলো বুঝিবা একটি—উঃ!

কোমল কমল ফেটে রক্ত ঝরছে। নিমাই ধরলেন চেপে। চেপে ধরলেন প্রিয়ের ক্ষতস্থান ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে। দূর করলেন বেদনা। টেনে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনদহন।

কিন্তু মন বড় খারাপ হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার। কেন এ অঘটন! কেন এ অমঙ্গল সঙ্কেত! এই জ্যোছনাক্ষরা যামিনী, এই আনন্দ মধুর লগ্ন—সব যেন তাঁর চোখে ম্লান হয়ে গেল। থর থর করে কেঁপে উঠল প্রিয়ার অন্তরাত্মা। একটি সু-দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো প্রিয়ার বিলোল-বক্ষ দীর্ণ করে।

অন্তর্যামী নিমাই সব বুঝতে পারলেন। ইঙ্গিতে সান্ত্বনা দিলেন প্রিয়াকে। বললেন—ও কিছু নয়।

অন্তর্যামীর সঙ্গে বুঝি অন্তর দিয়েই বলতে হয় কথা। বিষ্ণুপ্রিয়ার মন মুখর হলো। আত্মনিবেদনের মন্ত্র উচ্চারিত হলো গোপীতমার অন্তর গভীরে।

'বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥'

'ওগো, তুমি এ দাসীর সর্বমঙ্গলের নিদান। বিপদে বিঘ্নে, সুখে দুঃখে তুমি বিনে আর কেই-বা আমার আছে! হে প্রাণবল্লভ, আমাকে আশ্রয় দাও!'

'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥"

বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মবিলাপে তাঁর মনের মানুষের অন্তর গলে গেল। চিত্তচোর দূর করলেন প্রিয়ার চিত্তবিক্ষেপ। যেন বিষ্ণুপ্রিয়া শুনতে পেলেন তাঁর আত্মপুরুষের কণ্ঠ—'এইতো আমি আছি। ভয় কি?'

অপসৃত হলো তাঁর মনের খণ্ড মেঘ। চলে এলেন আনন্দ নিকেতন।

বাসর ঘর।

নিমাই বসে আছেন। বসে আছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। চতুর্দিকে প্রিয়ার প্রিয় সখীরা। রঙ্গালয়ে তারা যেন রঙ্গমত্ত। বর ও বধূকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল তারা।

হাসির ঝর্ণায় উচ্ছল চঞ্চল তাঁরা। বললেন নিমাইকে—'বলি, হ্যাগা বর মশাই, আমাদের সখীটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

নিমাই নীরব। দেখছেন গোপীবল্লভ গোপীদের বিলাস-বিভূতি। ওরা ধরে আনলেন প্রিয়াকে। বসিয়ে দিলেন নিমাইয়ের কোলের মধ্যে। হাসির হিল্লোলে ভরে গেল সারাটা ঘর। ডাকল আনন্দের বান। এ যেন ব্রজবিলাসিনীদের রাস-মণ্ডল।

—না গো বাপু। বর মশাইকে একটু মুক্তি দাও। দুটো খেয়ে নিক। সারা দিনের অভুক্ত। ক্ষুধা তো আর কম লাগে নি!

বিবাহ অন্তরে দোহে সনাতন দ্বিজগৃহে
এক কালে করিলা ভোজন। চৈঃ মঃ

ভোজনে বসলেন বর ও বধূ। আহারান্তে আবার শুরু হলো সখীদের মত্ততা। আনন্দ বিলাসের বিলোল বারিধিতে ওরা যেন অবগাহন করতে লাগল। দুহাতে প্রেম বিলিয়ে চললেন প্রেমময় রসময় নাগর গৌরাঙ্গসুন্দর। 'এই মত রজনী গোঙাইলা গুণমনি।' চৈঃ মঃ

সারাটা রাত কেটে গেল। ঘুম কারো চোখে এলো না। একটু তন্দ্রার আবেশও না। নিমাইয়ের বাসর-ঘরে সখীদের এ রজনী যাপন বড় মধুময়। ওঁরা যখন ভোরের আলো দেখলেন, শুনলেন যখন পাখীর কণ্ঠে প্রভাত বন্দনার সঙ্গীত, তখন মন তাঁদের বললে—না, রাত তুমি যেও না। যুগ যুগান্ত এমনি করে নিমাইয়ের বাসর-ঘরে তাঁর রঙ্গিনী হয়ে আমাদের জেগে থাকতে দাও!

মধু যামিনী ভোর হলো

॥ তেরো ॥

অরুণোদয় হয়েছে। সম্পন্ন করলেন নিমাই কুশণ্ডিকা কর্মাদি। আজ বিদায়ের দিন। সনাতন মিশ্রের গৃহ ছেড়ে যাবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। যাবেন নিমাইয়ের সঙ্গে শচীমায়ের স্নেহ-প্রচ্ছায়ে। সকলের মনই তাই ভারাক্রান্ত। বিষণ্ণ।

সমাগত স্বজনদের সঙ্গে এক আসরে বসে নিমাই খাওয়া দাওয়া শেষ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রহণ করলেন পতির পাতের প্রসাদ। অপরাহ্নের তেমন বাকী নেই আর। যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে ওঠে সবাই। শুরু হলো নৃত্যগীত। উত্থিত হলো জয়ধ্বনি। বারে বারে হুলুধ্বনি করতে লাগল নারীগণ। প্রিয়া যাবে পতিগৃহে। এ কি কম কথা! ভুবন-বল্লভের সঙ্গে রসবল্লভা বাঁধবেন ঘর। খেলবেন মানবীয় খেলা।

তাই তো পুণ্যশ্লোক পাঠ করতে লাগলেন পণ্ডিতমণ্ডলী। আশীর্বাদ করলেন যুগল মূর্তিকে বিপ্রগণ।

মহামায়ার মুখে কথাটি নেই। তাঁর অন্তর মন্থন চলছে। বেদনায় আরক্তিম হয়ে গিয়েছে স্নিগ্ধ বদন। এক একবার তাকাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। মোচন করছেন অশ্রু। সরে যাচ্ছেন প্রিয়ার কাছ থেকে।

বড় যত্নে লালন পালন করেছিলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে। সোহাগের শয্যায় শুইয়ে মাথা রেখেছেন সুখের উপাধানে। আজ মহামায়ার ঘর শূন্য হয়ে যাবে।

অদূরে দাঁড়িয়ে বিধুমুখী। বড় স্নেহ করতেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বাল-বিধবা বিধু। প্রিয়া ছিল তার স্নেহের সঙ্গিনী। আজ সেও চলে যাবে? অসহ্য এ বিরহ সন্তাপ। বিধুর পানে তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেললেন। কাঁদলেন বিধুমুখীও। এলেন এগিয়ে। মুছিয়ে দিতে লাগলেন প্রিয়ার চোখের জল।

যাদব কাঁদছে। কাঁদছে মাধব। পিতৃহারা ছেলে মাধব। তার জীবন বড় দুঃখের। শৈশবের দিনগুলো যেতে না যেতেই পিতাকে সে হারিয়েছে। মা, বিধুমুখী আর দিদি বিষ্ণুপ্রিয়ার স্নেহ যত্নে মাধব মানুষ হয়েছে। আজ দিদি তাদের ছেড়ে যাবে! একথা ভাবতে পারেনা তারা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তাদেরও আঁখির পার গড়িয়ে টপ টপ করে জল ঝরতে লাগল।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। বেদনাহত অন্তর। সমস্ত শরীর যেন তাঁর কাঁপছে থরথর করে। হাত বাড়িয়ে টেনে আনলেন দুটি ভাইকে কোলের মধ্যে। মুছিয়ে দিতে লাগলেন চোখের জল।

দাসদাসীরাও আজ ধীর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। এতদিনের কর্ম-চাঞ্চল্য থেকে তারা বসেছে হাত গুটিয়ে। কিছু ভালো লাগেনা। এখানে সেখানে দাড়িয়ে তারাও ফেলছে চোখের জল।

আহা, কান্নার সাগর সমুদ্রে যেন আজ বান ডেকেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিদায় বিধুর মুহূর্তে বনের পাখীও যেন বেদনার বেহাগ সুর শোনাতে লাগল।

ধান্য দূর্বা নিয়ে এগিয়ে এলেন সনাতন মিশ্র। সঙ্গে মহামায়া দেবীও আছেন। আশীর্বাদ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। টেনে নিলেন কোলে। আশিস চুম্বন করতে লাগলে জনক-জননী তাঁদের স্নেহের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

চোখের জলে সিক্ত হয়ে গিয়েছে তাদের চিবুক। হাহাকারে ভরে গেল সারাটা বক্ষ। চোখ তুলে যেন তাকাতে পারছেন না মেয়ের মুখের পানে।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। পরম স্নেহভরে সনাতন প্রিয়ার মাথাটি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।

—না, কেঁদো না! শুভ মুহূর্তে চোখের জল ফেলতে নেই মা।

মহামায়া দেবীর আর বাক্যস্ফুরণ হলো না। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল হয়ে প্রণাম করলেন গুরুজনদের। এই তো সেই রূপ রে! ওরে তোরা নয়নভরে দেখে নে বিশ্ববন্দিত, দেববন্দিত যুগল মূর্তি! সনাতন মিশ্র আবেগ মথিত অন্তরে নিমাইকে বললেন—

সনাতন দ্বিজবর বোলে হিয়া কাতর,
তোরে আমি কি বলিতে জানি।
আপনার নিজগুণে, লইলে মোর কন্যা দানে,
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি॥
আর নিবেদিয়া কথা, তুমি মোর জামাতা,
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া, তোর পাদপদ্ম পাঞা,
ইহা বলি গদগদ হয়॥
বাষ্প ছল ছল আঁখি, অরুণ বদন দেখি,
গদগদ আধ আধ বোলে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কর লঞা বিশ্বম্ভর করে দিয়া
ঢল ঢল নয়নের জলে॥ চৈঃ মঃ

প্রিয়ার হাতখানা ধরে সনাতন মিশ্র গৌরাঙ্গের হাতে রেখে বললেন—'তুমি জগৎপূজ্য বাবা! আমি আর কি বলব তোমাকে। নিজগুণে আমার কন্যাকে গ্রহণ করেছ তুমি। আমি ধন্য হয়েছি। কৃতার্থ হয়েছি। আমার কন্যা পরম ভাগ্যবতী বলেই তোমার মত বর লাভ করতে পারল।'

নিমাই সনাতন মিশ্রের পানে তাকিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি পূজ্যপাদ, আপনি আশীর্বাদ করুন।'

দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন সনাতন। একটু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন আবার, 'বাপ বিশ্বম্ভর, আমার এই অযোগ্য পুত্রটি তোমার হস্তে অর্পণ করলুম। এর সমস্ত ভার তোমাকে নিতে হবে বাপ!'

সম্মতি জানালেন নিমাই, 'আচ্ছা তাই হবে। যাদবের সব ভার আমি নিলেম।'

আর বিলম্ব নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া আর একবার অশ্রুসজল নয়নে তাকালেন মা-বাবার পানে। ওঁরা চোখ নামিয়ে নিলেন। গৌরাঙ্গ সুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে আরোহণ করলেন দোলায়। যাত্রা করলেন বাড়ির পথে।

ওঁরা তখনও দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে রইলেন সনাতন মিশ্রের সারাটা সংসারের লোক অশ্রু স্তিমিত নয়নে তাকিয়ে। যখন তাঁদের দোলা অবলুপ্ত হয়ে গেল দৃষ্টির দিগন্ত থেকে, তখন সনাতন পথের প্রান্তে চোখের দু ফোঁটা জল রেখে ঘরে ফিরলেন।

শচীদেবীর বাড়িতে এতক্ষণে পড়ে গিয়েছে আনন্দের সাড়া। বর বধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন জননী শচী।

॥ চৌদ্দ ॥

শচীদেবীর সীমা নেই আনন্দের।

প্রিয়াজীও পরিতৃপ্তিতে ভরপুর। দুজনার মনের বাসনাই হয়েছে পূর্ণ। চলে এসেছেন আনন্দের মধুরে। এক লক্ষ্মীকে হারিয়েছেন শচী, কিন্তু পেয়েছেন কোটী লক্ষ্মী-বন্দিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে। সুখের ঘর। সুখের সংসার। শচী আজ সত্যিই ভুলে গিয়েছেন তাঁর অতীত জীবনের কান্না করুণ কাহিনী।

আজ ফুলবাসর। এসেছেন প্রিয়ার সখীরা। নানা ফুলে সাজিয়েছেন দুগ্ধফেননিভ শয্যা। দিয়েছেন তাতে ফুলের ঝালর। ফুলের মালঞ্চ। কেন দেবেন না? ও শয্যায় যে আজ হবে গৌরপ্রিয়ার পরম মিলন। হবে মধুরা-রতির মূল উৎস বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নদীয়া-বিনোদের রসাস্বাদন। প্রাণবল্লভের তুষ্টি বিধান করবেন রসবল্লভা বিষ্ণুপ্রিয়া। বিশ্বজীবের স্মরণীয় রাত্রি। বরণীয় রাত্রি। তাই তো এতো ঘটা। এতো কুসুম সম্ভার।

চাঁদ উঠেছে নভে। মাটির ভুবনকে করেছে আলোকিত। ও যেন আজ বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বের পথে পথে।

গঙ্গার বুকে নৃত্যছন্দ। পুলক চঞ্চল সুরধুনী। প্রমত্তা। কেনই-বা হবে

না? তারই তীর-তীর্থে হয়েছিল এ মিলনের সূত্রপাত। শচীদেবীর গৃহে হলো তার পূর্ণ পরিণতি।

মৃদু মধুর হাওয়া বইছে। ভেসে বেড়াচ্ছে তাতে স্নিগ্ধ-চন্দন-গন্ধ। দু একটি চাতক ডেকে যায়। ডেকে যায় কোকিল কুহু কুহু। আহা কি মনোরম মধুর রজনী!

প্রিয়ার প্রিয় সখীতে বাড়ি ভরপুর। তার মধ্যে আবার কাঞ্চনা নায়িকা। বসলেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার পাশটিতে।

আজ আর সোনার অঙ্গে সোনার ভূষণ নয়। নয় কনক মাল্য। তবে?

বনের কুসুমে সাজিয়েছেন প্রিয়াকে। সাজিয়েছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। গৌর সুন্দরকেও বাদ দেয় নি। শুধু অঙ্গ ভূষণেই শেষ হলো না অনুষ্ঠান। শুরু হলো পুষ্প বর্ষণ। নদীয়ার নাগরিকবৃন্দ করে যেতে লাগল পুষ্পবৃষ্টি। ফুলে ফুলে ভরে গেল সমস্ত ঘর। স্নিগ্ধ সুবাসে চতুর্দিক হলো আমোদিত। গুরুজনেরা যুগল মূর্তিকে আশীর্বাদ করলেন। মহা আনন্দের মধ্যে সুসম্পন্ন হলো গৌরপ্রিয়ার শুভ পরিণয়।

কয়েকটা দিন হলো অতিক্রান্ত। দূর দেশ থেকে যারা এসেছিলেন তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। এসেছিলেন শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পত্নী সীতা দেবীকে নিয়ে। তিনিও নিমাইয়ের বিয়ে-থা দেখে প্রত্যাবর্তন করলেন শান্তিপুরে।

বেশ দিনগুলো কাটছিল শচীদেবীর। কিন্তু এলেন সনাতন মিশ্র। এলেন জামাই-মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে। শচীদেবী পুত্রবধূকে বিদায় দেবার প্রক্কালে রাখতে পারলেন না চোখের জল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকের মধ্যে ধরে চুম্বন করলেন শত শত। বললেন বেদনাদৃষ্ট কণ্ঠে, 'আজ আমার ঘর আবার আঁধার হলো মা। আমি শীগ্‌গিরই তোমাকে ফিরিয়ে আনব। তোমাকে ছেড়ে যে থাকতে পারিনে।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল বাধা মানল না। কয়েক বিন্দু অশ্রু চিবুক বেয়ে পড়ল ভূমিতে। মেয়ে জামাতাকে নিয়ে সনাতন চলে এলেন আপন ঘরে।

শচীর মন করে আই-ঢাই। গঙ্গায় যান স্নান করতে সকালে।

কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে হয় অনেক দেরী। এ দিকে নিমাই

প্রিয়াকে বাবার বাড়িতে রেখে এদ্দিনে ফিরে এসেছেন। তিনি মায়ের বিলম্বের কারণটি জেনে নিলেন অতি সহজেই। বললেন একদিন জননী শচীদেবীকে। বললেন নিমাই, 'মা' রোজ তুমি তোমার বউকে দেখতে যে কুটুম বাড়িতে যাও, এটা কিন্তু ভালো দেখায় না।'

শচীদেবী যেন নিমাইয়ের কথা শুনে উঠলেন চম্‌কে। মন যেন বললে, 'কি করি বল ? ওকে না দেখে যে আমি থাকতে পারি নে।'

বেশ তো ! 'তাকে নিয়ে এলেই তো পার !'

এই কথাটি শুনবার জন্যেই শচীদেবীর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। আনন্দে আত্মহারা শচী। ফিরিয়েই আনবেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ভালো দিন তারিখ দেখা হলো। শচীদেবী পাঠিয়ে দিলেন নিমাইকে। পাঠিয়ে দিলেন সনাতনের বাড়িতে। নিমাই নিয়ে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

শচীর সংসারের সব ভার তুলে নিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শচী এখন মুক্ত। কোনো কাজে দিতে হয় না হাত। বয়স তো নেহাৎ কম হয়নি। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই একটি কাজও করতে দেন না মা'কে।

সে দিন ঘটল এক কাণ্ড।

খেতে বসেছেন নিমাই। কাছে বসে শচীদেবী। অদূরে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। স্থির নেত্র। অপলক দৃষ্টি। মনের দিগন্তে একটি প্রশ্ন বারে বারে মারছিল উঁকি ঝুকি।

কি সে প্রশ্নটি ?

—কেমন খাচ্ছ গা ? পাক ভালো হয়েছে তো ?

ঠিক তখন অন্তর্যামী নিমাই চাঁদ মায়ের পানে তাকিয়ে বলে উঠলেন—

—এ নিশ্চয় তুমি রেঁধেছ মা ?

বললেন শচীদেবী—কেন রে ? আমি রাঁধতে যাব কেন ?

—তবে বলো, তুমি দেখিয়ে দিয়েছ ?

শচীর অধর সম্পুটে চুমু দিল স্নিগ্ধ হাসি। নতুন বউ। তাকে একটু শিখিয়ে বুঝিয়ে না দিলে এ সংসারের ধাত বুঝবে কি করে ? নতুন নতুন তাই একটু বলে কয়ে দিতে হয়।

নিমাই খাচ্ছেন পরম তৃপ্তি ভরে। এ যেন বহুদিনকার পরিচিত

প্রিয়জনের হাতের পাক। আস্বাদে সাধে একেবারে রসনা-রসিত বস্তু। বললেন তাই মায়ের পানে তাকিয়ে নিমাই, 'দেখো মা, কত খেয়েছি। তুমি না দেখিয়ে দিলে এমন রান্না করতে পারে কে ?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্ত দেহ যেন স্বেদ-সিক্ত হয়ে গেল। যাক্, বাপু, তুমি তো ভালো খেয়েছ। ওই আমার যথেষ্ট। এইটুকুন পেলেই আমি খুশী। শুধু তোমার তৃপ্তি সাধন করাই আমার আজন্মের সাধন ভজন। আমার যুগ যুগান্তের ধ্যান মনন।

ভোরের পাখী ডাকতে না ডাকতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রিয়ার। কেউ তখন জাগেন না আর। ঘর নিকিয়ে, স্নান সমাপন করে ফিরে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আলপনা দেন বিষ্ণুমন্দিরে। তোলেন বাগান থেকে পূজার ফুল। তারপরে যান হেশেলে। সকলের সেবা সাঙ্গ হলে তবে তাঁর জলগ্রহণ হয়। শচীদেবী প্রিয়াকে পেয়ে পরম খুশী। এমন কি পাড়া প্রতিবেশী পর্যন্ত প্রিয়ার নামটি মুখ থেকে রাখেন না।—অমন বউ বড় ভাগ্যে মেলে। শচীদেবীর সৌভাগ্য বলতে হবে।

প্রতিবেশীর কথা শুনে শচীদেবীর বক্ষ গর্বে ও গৌরবে ভরে যায়। আনন্দে অধীর শচী সব কথাগুলো বলেন ছেলের কাছে। নিমাই মায়ের কথা শুনে পরম খুশী। বললেন মায়ের পানে তাকিয়ে, 'আমি পারিনা তোমার সেবা করতে। কোনো দিন যে পারব এমন ভরসাটিও নেই। কিন্তু যে আমার এই বাসনা পূরণ করবে, আমি তার কাছে চিরটা জীবন থাকব বিকিয়ে। তার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না মা।'

শচীদেবী আনন্দ-বিবশ কণ্ঠে বললেন—'লোকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করে আনন্দ পায়। কিন্তু আমি আমার বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়াকে পেয়ে লাভ করছি কোটিগুণ আনন্দ।'

কেনই-বা পাবেন না ? শচীর ঘরে যে সাক্ষাৎ গোলোক-পতি এসেছেন। সঙ্গে তারই বিলাস-মূর্তি বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনটা করে আঁকু বাঁকু।

কেন ?

প্রিয়-সান্নিধ্য কামনায়।

সারাটা দিন প্রায় নিমাই থাকেন টোলে ছাত্রদের নিয়ে। মুহূর্তের অবকাশ হয়না ছুটো মনের মত কথা বলবার। কেবল খাবার সময় ঘরে আসেন। সামান্য সময়। তা হোক। বিষ্ণুপ্রিয়া মন, ধ্যান, যোগ করে দেন পতির প্রিয় কর্মে। পা ধোয়ার জল রাখেন হাতের কাছে। এগিয়ে দেন খড়ম। গামছা খানাও কাছেই রাখেন। তেলের পাত্রটি আর খুঁজতে হয়না এদিক সেদিক। সব ছিমছাম। গুছগাছ। স্নানান্তে ছুটো খেয়েই আবার পড়েন নিমাই বেড়িয়ে। প্রিয়ার প্রাণটা আইঢাই করে ওঠে। যেন একান্ত করে মন পেতে চায় প্রাণবল্লভকে।

সেদিন আর যেন পারছিলেন না প্রিয়া। গভীর মনের অতলে ডুবে গিয়েছিল তাঁর ধ্যানের চোখ। অপলক তাকিয়ে ছিলেন। দেখছিলেন বুঝি বা তাঁর অন্তর সুন্দরের প্রিয়-তনু। আর একান্ত নিবির ভাবে ডাকছিলেন নাম ধরে মনে মনে।

নাম আর নামী। প্রভেদ নেই। তাই গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রিয়তমা ভক্তের অন্তরের আহ্বান পারলেন না উপেক্ষা করতে। তিনি এলেন ছুটে ঘরে। প্রেমপাগল যে প্রেমের কাঙ্গাল। না এসে উপায় কি ?

একেবার ছুটে এলেন প্রিয়ার কাছে। যেন ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব। দাঁড়ালেন মুখোমুখী। বললেন প্রেম-বিগলিত কণ্ঠে, 'ওগো, তোমার ডাকে আমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছি।' তোমার ও মুখ আমি দেখি। সর্বদার জন্যে জেগে থাকে আমার হৃদয়ে। আমি আমার সব কথা বলতে পারি না তোমাকে। তুমিও পারো না। তাই ছুটে এলাম। বলো, কি বলবে ?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ ছুটি অশ্রুসজল হ'য়ে এলো। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীর। আনন্দে তাঁর কণ্ঠ গিয়েছে রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু অন্তরে অজস্র কথা গুমরে ওঠে। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া—তাকালেন তাঁর প্রাণবল্লভের পানে। নয়ন ভরে গেল রূপে। সমস্ত প্রাণ যেন প্লাবিত হয়ে উঠল নিমাইয়ের অমিয় সৌন্দর্যে। বিষ্ণুপ্রিয়ার আবেগ-মথিত অন্তর থেকে উৎসারিত হলো সহজ ও সরল একটি উক্তি—'তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারিনে। ওগো আমায় ভুলো না।'

কান্নার অশ্রু সিক্ত করে দিল বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নযুগল। অঙ্গ এলো

অবশ হয়ে। হারিয়ে গেল জ্ঞান। দেহ কম্পিত। স্বেদ-সিক্ত—শিহরিত।

গৌরাঙ্গসুন্দর ধরে তুললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। করলেন আশ্বস্ত। বললেন মধুর কণ্ঠে, 'প্রিয়তমে, তুমি আমার দেহ, মন, প্রাণ। তুমি আমার আত্মা, আনন্দ, তৃপ্তি। তোমাকে ভুলতে পারি?'

পরিতৃপ্তির সুধা সমুদ্রে প্রিয়া যেন নিমজ্জিতা। ফিরে এসেছে তাঁর জ্ঞান। একটু লজ্জিত হলেন যেন। নত নেত্রে শুনতে লাগলেন প্রাণ প্রভুর মধুক্ষরা কণ্ঠ—'কত শত ছাত্রকে পড়াতে হয়। তাকিয়ে থাকে তারা আমার পানে। তাইতো সারাটা দিন বাইরে থাকি। কর্তব্যকর্মে কি অবহেলা করতে আছে? যাই এখন?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুমতি-প্রার্থী হয়ে বিশ্বম্ভর দাঁড়িয়ে। যেতে দিতে মন চায় না। তবুও যেতে দিতে হয়। কে কবে কাকে ধরে রাখতে পেরেছিল? সংসারের নানা হাটে মানুষ নানা কাজ করতে আসে। তাইতো তাদের স্থিতিহীন গতাগতি।

একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। নীরবে সম্মতি জানালেন বিষ্ণুপ্রিয়া—এসো।

নিমাই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রিয়া রইলেন তাকিয়ে। তাকিয়ে রইলেন বাতায়নের পথে।

॥ পনেরো ॥

মন্থরগতি দুঃখ। ও যেন গিয়েও ফিরে আসে।

একটু সুখের ছোঁয়া লেগেছিল শচীর সংসারে। বেদনার শেষ যামে দেখতে পেয়েছিলেন প্রভাতের কারুণ্য নির্ঝর। কিন্তু একি হলো!

আদিগন্ত অবলীল হয়ে গেল যেন বিষাদের হিম ছায়ায়। শচী যেন পাগলিনীর মত উদ্‌ভ্রান্ত। বিমূঢ়।

মাত্র একটি বছর হয়েছে গত। এরই মধ্যে সব তচনচ হয়ে যাবে? ভাবতে পারেন না শচী। তাঁর মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে। দুরু

দুরু করে বক্ষ। চোখ দুটো অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে দিবস যামিনী।

কেন, এমন হলো কেন শচীর ?

নিমাই অটল সিদ্ধান্তে। যাবেন গয়াধামে। যাবেন গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে। পিতৃপুরুষের আত্মাকে মুক্ত করে দেবেন নিমাই। তাই বললেন একদিন মায়ের কাছে—'মা, অনিত্য এ সংসার। কখন কি হবে কেউ জানে না।'

শচীদেবী প্রথমটায় একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কি বলছে নিমাই! তখনও বলেই চলেছেন—'বাবা আমাকে কত ভালো বাসতেন। কিন্তু আমি তার জন্যে কিছু করতে পারিনি। মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা। কত না কষ্ট দিয়েছি বাবাকে। কত লোক এসে নালিশ জানাত আমার নামে বাবার কাছে। করত তিরস্কার। বাবা ব্যথা পেতেন। অভিমানে দুঃখে খুঁজতে বের হতেন আমাকে। এই কাঠফাটা রোদে গায়ের পথে পথে আমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াতেন। কিন্তু আমি তো বাবার জন্যে কিছু করতে পারলাম না মা!'

শচীদেবী চোখ মুছেন, বললেন—আজ আবার এ কথা কেন তুললি বাপ ?

নিমাই বেদনাহত অন্তরে বলতে লাগলেন—'বড় কষ্ট হয় মা। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তবে আমি তাঁর চরণ সেবা করে প্রাণ জুড়াতাম!'

নিমাই কেঁদে ফেললেন। পুত্রের চোখে জল দেখে মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে গেল। তিনি অধীর হয়ে নিমাইয়ের হাত ধরে বললেন—'ওরে, শোকে দুঃখে আমি পাগল হয়ে গেছি। কেবল তোদের মুখ চেয়ে সব ভুলে আছি। না, ও কথা তুলে আর নতুন করে তুই আমাকে ব্যাকুল করিস নে। এক কথায় কত কথা মনে পড়ে। হঠাৎ তুই আজ এ কথা তুললি কেন ?'

নিমাই ক্ষণকাল নীরব রইলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি গয়াধামে যাবো স্থির করেছি। শুনেছি, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি হয়। তুমি অনুমতি দাও!

শচীদেবী পড়লেন মহা সংকটে। একদিকে পুত্রের পিতৃকর্ম।

অন্যদিকে জননীর স্নেহ বন্ধন। কেমন করে তিনি নিমাইকে ছেড়ে থাকবেন? নিমাইহীন সংসারে শচী কি করে ঢুকবেন!

অনেকটা সময় নীরবতার মধ্যে কাটল। এক সময়ে শচীদেবী ছেলের পানে তাকিয়ে বললেন আহত কণ্ঠে—'যখন তুই গয়াধামেই যাচ্ছিস, তখন তোর জীবন্ত জননীর নামেও একটা পিণ্ড দিয়ে আসিস।'

গয়া যদি যাবে বাপ শুনরে নিমাই।
মোর নামে এক পিণ্ড দিসরে তথাই॥ চৈঃ মঃ।

ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া শেলবিদ্ধা। তাঁর নয়ন দুটো অশ্রু-সিক্ত। এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব কথাগুলো শুনছিলেন তিনি। চনমনে হয়ে গেল মনটা। ভাবলেন—বারেক মিনতি জানাব। বলব, না, তুমি এখন যেও না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভাবনা উবে গেল। মা যেখানে কিছু বলতে পারলে না, সেখানে আমি কি করে ধরে রাখব তাঁকে ?

বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহ-দহনের আত্মপীড়ন সইতে লাগলেন।

দিনক্ষণ দেখা হয়ে গেল। শচীদেবী আর কোন আপত্তি তুললেন না। কিন্তু একা কি করে ছাড়বেন তিনি নিমাইকে? কেন, সঙ্গে তো ছাত্ররা যাচ্ছে। তাহলেও একজন অভিভাবক শ্রেণীর লোক থাকা দরকার তো। তবে কে যাবেন আর?

শচীদেবী ডাকালেন নিমাইয়ের মেসো আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরকে। বললেন সব কথা। চন্দ্রশেখর সম্মত হলেন নিমাইয়ের সঙ্গে যেতে। অনেকটা চিন্তামুক্ত হলেন শচী। বার বার বলে দিলেন শচী, বলে দিলেন চন্দ্রশেখরকে—যেন খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। কাজ শেষ হলেই যেন বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়।

আশ্বস্ত করলেন চন্দ্রশেখর জননী শচীকে। নিমাইয়ের শিষ্যরাও তৈরী হয়ে নিল!

তখনকার দিন কাল। তারপরে আবার হাঁটা পথেই যেতে হয় তীর্থ যাত্রায় দুর দুরান্তরে। বলি চিন্তা কি কম?

সব আয়োজন পূর্ণ। আজ নিমাই যাত্রা করবেন। যাত্রার প্রাক্কালে

নিমাই ডাকলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ডাকলেন নির্জনে। বললেন তাঁকে—'আমি গয়াধামে যাচ্ছি বাবার কাজ করতে। শীতের মধ্যেই ফিরব। তুমি সব সময়ে মায়ের কাছে থাকবে। তাঁর সেবা করবে।'

প্রিয়া নীরব মৌন। বাক্য-স্ফুরণ হলো না একটিও। কেবল দুচোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। প্রিয়ার চোখের জল নিমাইকে আঘাত করল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর প্রশান্ত বক্ষে। বললেন আবেগমথিত কণ্ঠে, 'প্রিয়ে, তোমাকে ছেড়ে আমি বেশীদিন বিদেশে থাকতে পারব না। শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তুমি ধৈর্য ধরে মায়ের সেবা করো।'

আর কোন কথা নয়। অশ্রুধারার মধ্যেই অভিসিক্ত হলো।বেদনার অধ্যায়।

শচীদেবী ছেলের সঙ্গে গঙ্গার ঘাট অবধি গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া এসে আশ্রয় নিলেন প্রভুর শয্যায়। শূন্য ঘর। শূন্য মন। শূন্য আদিগন্ত। প্রিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। পাষাণচাপা বক্ষ-পঞ্জরের দহন জ্বালাকে যদি কান্নার অশ্রুতে নির্বাপিত করা যায়।

কাঞ্চনা এসে ডাকলেন—প্রিয়া !

তাঁকে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্মৃতির সমুদ্রটা উদ্‌বেল হয়ে উঠল। অঝোরে কেঁদে ফেললেন প্রিয়া। কেঁদে ফেললেন কাঞ্চনার সামনে বসে। প্রিয়ার দুঃখে সখী কাঞ্চনাও বিহ্বল। তাঁর চোখেও জল এলো। দুই সখী কান্নার মধ্যে ভাসতে লাগলেন। অনেকটা সময় অমনি ধারা কাটল। প্রিয়ার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন কাঞ্চনা—

'সই, আর কাঁদিস নে। চোখ মোছ। তোর স্বামী ধর্মপ্রাণ। ধর্ম কার্যে গিয়েছেন, তুই না তার ধর্মপত্নী, সহধর্মিনী ? তুই যদি এমন করে কাঁদিস, তাহলে যে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটবে। চল ভাই, আমরা আজ ফুল তুলে মালা গাঁথি। সেই মালা দিয়ে সাজাব আজ লক্ষ্মী-নারায়ণকে।'

শচাদেবী ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর পানে তাকান যায় না। যেন একটা প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছেন। বুকের মধ্যে যেন জ্বলছে বেদনার অনল। প্রিয়ার পানে তাকিয়ে শচী আর একবার চোখ মুছলেন। ফেললেন দীর্ঘ শ্বাস।

॥ ষোল ॥

পথ ফুরিয়ে আসে।

গয়া-তীর্থের পথ। নিমাইয়ের মধ্যে জেগে ওঠে অন্য ভাব। অন্য মন। একটা পরিবর্তনের আভাস প্রকাশের ছোঁয়া লাগে তাঁর দেহমনে। ক্রমেই যেন ধীর শান্ত গম্ভীর হয়ে যান তিনি।

এই সেই পূণ্যতীর্থ। যুক্ত করে প্রণাম করলেন নিমাই। প্রণাম করলেন গয়াক্ষেত্রে পদার্পণ করে গয়াধামের উদ্দেশে। উপনীত হলেন মন্দার পর্বত সমীপে। পরম আনন্দ ও তৃপ্তিভরে স্নান করলেন চৌরান্ধয়ক নদে। করলেন দেব ও পিতৃতর্পণ। তীর্থপুরোহিতদের সঙ্গে আরোহণ করলেন মন্দার পর্বতে। শ্রীশ্রীমধুসূদন দর্শন করে চলে এলেন পর্বতপ্রান্তে। পুরোহিত-গৃহে।

পথের ক্লান্তিতে ক্লান্ত নিমাই। শরীরও যেন ভালো নেই। জ্বর এলো। প্রবল জ্বর। আকুল শিষ্যবৃন্দ। চন্দ্রশেখরের মনটাও গেল খারাপ হয়ে। ওরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল।

প্রভু তাদের কাছে ডাকলেন। বললেন ধীর কণ্ঠে—'তোমরা চিন্তা করো না। মধুসূদনের আশ্রিত পুরুতদের চরণামৃত নিয়ে এসো। পান করিয়ে দাও আমাকে। জ্বর এক্ষণই ছেড়ে যাবে।'

ভক্ত শিষ্যবৃন্দ পড়লেন মহাভাবনায়। গুরুদেবকে কেমন করে খাওয়াবেন পুরুতদের পাদোদক! তা কি সম্ভব?

—কেন, ওরা যে সকলেই মধুসূদনের দাস। তাঁর ভক্ত। তাঁরই আশ্রিত।

ওরা যে জীবন, মরণ সব-কিছু মধুসূদনকে উৎসর্গ করে পড়ে আছে তাঁরই পাদপদ্ম স্মরণ করে। দাও, এনে দাও ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণদের চরণ-ধৌত অমৃত! তা না হলে যে 'এ জ্বর পিতৃকর্মে বাধার সৃষ্টি করবে।'

লীলাময় লীলাচ্ছলে শিক্ষা দিচ্ছেন শিষ্যদের। বাধ্য হলেন তাঁরা

গুরু-আজ্ঞা পালন করতে। কিন্তু মন তেমন সায় দিল না। পান করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বিপ্র পাদোদক।

আশ্চর্য ফল ফলল। একটু আগেও দেহ পুড়ে যাচ্ছিল জ্বরের উত্তাপে। কিন্তু মুহূর্তে সে অঙ্গ হয়ে গেল শীতল শান্ত। বিন্দু জ্বরের আভাস রইল না। স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি দিয়ে বললেন প্রভু, 'দেখলে তো, কি অপার মাহাত্ম্য বিপ্র-পাদোদকের? ব্রাহ্মণদের কি অবজ্ঞা করতে আছে!'

যারা ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকে তাঁরা কি যে-সে? ওদের মধ্যেই যে ভগবানের বসতি-প্রীতি। তাঁদের ভালো বাসতে হয়। দিতে হয় প্রেম। তবেই তিনি, সেই সর্বজীবের জীবন—খুশী হন। চেতদর্পণ ধৌত করে দাও। উদিত হবে চৈতন্যের পূর্ণচন্দ্র।

নারদের বড় অহংকার—আমার মত ভক্ত আর দ্বিতীয়টি নেই। শ্রীকৃষ্ণ নারদের গর্ব খর্ব করলেন। কেমন করে? শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। নারদ অধীর হয়ে সুধালেন—কি হলে এ পীড়া থেকে মুক্ত হতে পারো তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—নারদ, আমার ভক্তদের পদরজ এনে লিপে দাও আমার ললাটে। আমি রোগমুক্ত হবো।

বীণা বাজিয়ে নারদ ঘুরে বেড়ায়। ভক্তদের কাছে নিবেদন করে প্রভুর অভিপ্রায়। কিন্তু কেউ সম্মত হলো না। প্রভুর ললাটে পায়ের ধূলো দিলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না! তা কি সম্ভব!

তবে এখন উপায়? নারদ ছুটে এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বললেন, না, কেউ দিলে না। বললে, তোমার ললাটে পায়ের ধূলো দিলে তাদের নরকেও হবে না ঠাঁই।

শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসলেন—আচ্ছা নারদ, তুমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলে?

—না।

—একবার সেখানে গিয়ে দেখো তো।

নারদ ছুটল ত্রস্ত হয়ে। গোপীরা যাচ্ছিল বাজারে। মাথায় তাদের ননি আর ক্ষীরের ভার। নারদকে দেখে তারা পরম খুশী ভরে শুধাল—কি সংবাদ ঠাকুর?

নারদ বললেন সব কথা খুলে। শিথিল হয়ে গেল গপীদের দেহ।

মন হলো উচাটন। উদ্‌বেগাকুল কণ্ঠে তারা বললে. এখনই ঠাকুর তুমি ফিরে যাও। জেনে এসো কি হলে প্রভু রোগমুক্ত হবেন!

নারদ বললেন—চাই ভক্তদের পদধূলি।

এক সঙ্গেই গোপীরা বলে উঠল—এ আর বেশী কি। কই, তোমার পাত্র দাও।

সকলে মিলে পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছে পায়ের ধূলোতে। নারদ তো অবাক! বললেন—এ তোমরা কি করছ! নরকগামী হবে না?

গোপীদের কণ্ঠে কান্নার কাতরিমা—নরকে যাই যাবো, কিন্তু প্রভু তো আমাদের ভালো হয়ে উঠবেন!

একেই বলে ব্রজ-প্রেম। গোপীদের ভালোবাসা। রাগানুগা ভক্তি। নরকে যেতে বিন্দু ভাবনা নেই। ভয় নেই। নেই শঙ্কা সন্ত্রাস। উৎকণ্ঠা তাদের প্রাণবল্লভকে নিয়ে। আমরা নরকগামী হব তাও ভালো, তবুও তুমি ভালো হও। সুস্থ হও। চলে এসো আরোগ্য-নিকেতনে।

চোখ খুলল নারদের। আর বুঝতে বিলম্ব হলো না প্রভুর শিরঃপীড়ার যথার্থ অর্থটি।

গৌরাঙ্গ-সুন্দরেরও একই খেলা। কৃষ্ণরূপে নারদের দম্ভ অহংকারকে করলেন অবলীন। গৌররূপে শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন বিপ্রদের ভক্তি করতে।

জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন। করলেন করণীয় কর্ম। চলে এলেন চক্রবেড়ে। এই সেই পূণ্য স্থান। এখানেই রয়েছে বিষ্ণু-মন্দিরের অভ্যন্তরে পাষাণ ফলকে অঙ্কিত ভগবানের চরণ-চিহ্ন। পুরাণ বললেন—পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন গয়াসুর। প্রবল প্রতাপে অজেয় শক্তিধর গয়াসুর যুদ্ধে পরাস্ত করলেন দেবতাদের। বিতাড়িত করলেন স্বর্গ থেকে। কাতর প্রার্থনা জেগে ওঠে দেবতাদের কণ্ঠে। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে চাইলেন প্রতিকার। বিষ্ণু এবারে স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধে। ভক্ত গয়াসুর হলেন পরাজিত। বিষ্ণু ভক্তগয়াসুরের দেহে স্থাপন করলেন তাঁর শ্রীচরণ। চরণস্পর্শে গয়াসুর পরিণত হলেন পাষাণে। এই তো সেই গয়াসুরের পাষাণ দেহ। আর তাঁরই বক্ষে ভক্ত-প্রাণ ভগবানের চরণ-চিহ্ন। বিষ্ণুর বরে এখানে পিণ্ড দান করলে মুক্তি ঘটে

পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার। পরিতৃপ্ত হন গয়াসুরের আত্মা। এ বিশ্বাস মানুষের যুগ-যুগান্তের। এ মন্দিরও নাকি গয়াসুরই করেছিলেন স্থাপিত। তাঁরই নামে এ পুণ্যতীর্থের নাম হয়েছে 'গয়া' ধাম।

পিতৃকার্য সমাধা করলেন নিমাই। তাকিয়ে রইলেন অনিমেষ নেত্রে। দেখতে লাগলেন সেই যুগ-যুগান্তের বাঞ্ছিত চির উজ্জল, চির ভাস্বর পবিত্র চরণ চিহ্ন।

মুখর মন্দিরের পূজারীগণ। তাদের কণ্ঠে নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে এই চরণের অপার মহিমা।—দেখো, চেয়ে দেখো। প্রাণ ভরে দর্শন করো বিষ্ণুর চরণারবিন্দ। এই শ্রীচরণ-ধ্যানে তন্ময় যোগী। মন্ময় মরমী। এই চরণ সন্ধানে একতাড়া লয়ে পথে বেড়িয়েছে বাউল। এই তো সেই চরণ, যাঁর জন্যে মহাযোগী শিব-শঙ্কর ধ্যানমগ্ন। সমাধিস্থ। এই চরণ থেকেই ত্রিলোক-পাবনী প্রবাহিনী গঙ্গার উদ্ভব। দেখো, মানস নয়নে দেখো। ধ্যানের চোখে দর্শন করো। তোমার অভিলষিত, তোমার ঈপ্‌সিত, তোমার আরাধ্যতম সুন্দরের পদতীর্থ।

তন্ময় শ্রীগৌরাঙ্গ। স্থির, নিশ্চল, অপলক। ভাবাবেশে অবশ দেহ। কানে ভেসে আসছে বিশ্ববিমোহন বংশীর অভয় সঙ্গীত। ধীরে ধীরে অতলায়িত হয়ে গেলেন তিনি। অতলায়িত হয়ে গেলেন মনের অতল গভীরে। ভেসে উঠল দিব্য স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল সুন্দর একটি চিত্তহর মূর্তি।

নিমাই নীরব। সর্বাঙ্গে কম্পন। স্বেদে, ক্লেদে, অশ্রুতে নিমজ্জিত। থর থর করে কাঁপছে সারাটা অঙ্গ। আর যেন দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি-টুকুও নেই।

অদূরে দাঁড়িয়ে পরম কৃষ্ণ-ভক্ত ঈশ্বরপুরী। এতক্ষণ তিনি সব দেখছিলেন। দেখছিলেন নিমাইয়ের দেহে স্বাত্তিক বিকারের অপূর্ব প্রকাশ।

ভক্ত রাখেন ভক্তের অন্তরের সন্ধান। বুঝতে পারেন প্রেমিক প্রেমের বন্যার বেগ। নবদ্বীপে নিমাইকে দেখেছিলেন ঈশ্বরপুরী। বুঝেছিলেন তখন, এ সহজ সুন্দর চঞ্চল তরুণটিকে। আজ যেন তার চেয়ে বেশী করে আপন হয়ে গেল নিমাই তাঁর। ত্রস্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরপুরী। ব্যগ্র ব্যাকুল ঈশ্বরপুরী। দুহাত প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এলেন। বুকের

মধ্যে টেনে নিলেন নিমাইয়ের এলিয়ে পড়া দেহখানি। নিয়ে গেলেন দূরে। নাম-স্নিগ্ধ অঙ্গস্পর্শে নিমাই ফিরে পেলেন জ্ঞান। আয়ত সিক্ত নয়ন মেলে তাকালেন। দুচোখে নামল অঝোর ধারা। আকুল নিমাই। বিরহ-বিলাপে ভেঙ্গে পড়লেন—'প্রভু, আমাকে কৃপা করো। ছিন্ন করো আমার মোহবন্ধন। তোমার কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হোক। নিরবধি আমাকে ভাসতে দাও কৃষ্ণপ্রেম-সুধা-সাগরে। আর আমার অন্য কোন কামনা নেই প্রভু!'

কান্নায় দুগণ্ড ভেসে যায়। ঈশ্বরপুরীর চোখেও অশ্রুর শান্তি বর্ষণ হচ্ছে। নিমাইকে স্পর্শ করে তাঁর প্রাণেও এসেছে অপার আনন্দের অপূর্ব পুলক। রোমাঞ্চিত পুরী আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন 'শান্ত হও পণ্ডিত। তোমাকে আমি চিনেছি। কি সাধ্য আমার, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? একটু স্থির হও। শান্ত হও। পরে দেখা করব আমি।'

চন্দ্রশেখর নির্বাক হয়ে গিয়েছেন। বিস্ময়ে বিস্ফারিত তাঁর নয়ন। তিনি ভেবেই পাননা সদাচঞ্চল, তর্কবিদ্, হাস্যোচ্ছল শাস্ত্রালাপী নিমাইয়ের এ হলো কি! কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

শুভদিন হলো সমাগত। ঈশ্বরপুরী দীক্ষা দিলেন নিমাইকে। দিলেন দশাক্ষরী মন্ত্র। গোপীজন বল্লভের নাম। নাম দানান্তে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন গুরু-শিষ্য। মিলন হলো চার চোখের। প্রেমাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন তাঁরা। আহা, এ কি অপূর্ব মধুর মুহূর্ত। জীবনের রূপান্তর হলো। কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বরপুরী নিমাইকে নিয়ে এলেন বিরহের কান্না থেকে তৃপ্তির সন্তোষে। নিয়ে এলেন আনন্দের মধুরে।

প্রমত্ত নিমাই। কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণভাবনা আর কৃষ্ণনাম হলো তাঁর দিবস শর্বরীর অনুধ্যান। অশ্রুপ্লাবনে দু চোখ ডুবন্ত। চন্দ্রশেখরের পানে তাকিয়ে কাতর কণ্ঠে বলেন—'আপনারা ফিরে যান। আমি আর বাড়ি যাবো না। আমি যাবো বৃন্দাবনে। খুঁজব আমার কৃষ্ণকে।'

আকুল নিমাই। আর যেন সহ্য করতে পারছেন না কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা। এ বড় দুঃসহ। বড়ই মর্মান্তিক।—ও গো, তুমি দেখা দাও! প্রতিভাসিত হও আমার নয়নে। আমার ধ্যানে। তোমার শ্যামশান্ত জ্যোতিচ্ছটায় আমাকে ভাসিয়ে নাও। ডুবিয়ে রাখো। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

চন্দ্রশেখর পড়লেন মহা বিপদে। কি করে তিনি ফিরে যাবেন শচীদেবীর কাছে। কি বলে দেবেন তাকে সান্ত্বনা। নিমাই নিষ্ঠায় অটল। এখনও তিনি বলছেন—'মাকে বলবেন, 'তাঁর নিমাই গেছে শ্যামসুন্দরকে খুঁজতে। বৃথা দুঃখ যেন তিনি না করেন।'

অনেক কষ্টে নিমাইকে ফিরিয়ে আনলেন সহজে। বললেন চন্দ্রশেখর নিমাইকে বুঝিয়ে—তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া আমার বাতুলতা। তবুও বলি, তুমি কি বোঝনা, যদি তুমি না ফিরে যাও বাড়িতে, তবে তোমার মা আর বাঁচবেন না ? তোমার মত ছেলে যদি না মায়ের ব্যথা, মায়ের দুঃখ বোঝে, তবে বলো আর কে বুঝবে ? কে মুছাবে জননীর অশ্রুধারা। কে দেবে শত আঘাতে জীর্ণ মাতৃবক্ষে সান্ত্বনা ? চলো বাবা, বাড়ি চলো। তোমার কৃষ্ণ সর্বত্র বিরাজিত। বিশ্বময় তাঁর আসন। বাড়ি গিয়ে ভজনা করবে শ্যামসুন্দরের।

চন্দ্রশেখরের কথায় যেন সম্বিত ফেরল তাঁর। সম্মত হলেন বাড়ি যেতে। চন্দ্রশেখর যেন বাঁচলেন হাঁপ ছেড়ে। কোনো রকম মায়ের ছেলে মায়ের হাতে পৌছে দিতে পারলেই তিনি রক্ষা পাবেন।

বহু কষ্টে ক্লিষ্টে শিষ্যও নিমাই সহ চন্দ্রশেখর যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন নবদ্বীপের উদ্দেশে। সকলের মাঝে নিমাই। চন্দ্রশেখরের প্রহরী নয়ন সর্বদা তাঁর পানেই অপলক।

॥ সতেরো ॥

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

দিন যায়। রাত নামে। নিশীথ নির্জনে বসে থাকেন নিমাই। বসে থাকেন নক্ষত্র দীপ্ত আকাশের পানে তাকিয়ে। কণ্ঠে কাতর কান্না। নয়নে অজস্র বর্ষণ। অন্তরে কৃষ্ণ-কান্তির বিভাদীপ্তি। নিমাই নিথর। অপলক। বিতনিদ্র। ঘুম ছেড়ে গেছে নয়নের বৃন্ত থেকে। কেবল বারে বারে করুণ কণ্ঠে ডাকছেন—হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

আত্মায় কৃষ্ণ। আকাশে কৃষ্ণ। নয়নে কৃষ্ণ। চিন্তায় কৃষ্ণ। ধ্যানে

মনে সর্বত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণময় বিশ্বভুবন। কৃষ্ণ ছাড়া আর যেন কিছুই আভাসিত হচ্ছে না। নিজেও কৃষ্ণ হয়ে গিয়েছেন নিমাই। দেখছেন তাঁরই স্বরূপ প্রকাশের বিচিত্র বিভূতি। আত্মদর্শনের আনন্দছন্দে মন তাঁর বিভোর। বিপ্লুত। বিতত।

শ্রীমান পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব। নিমাইয়ের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হয়েছে তোমার বিশ্বম্ভর?' কেন কাঁদছো?

জবাব দিতে পারেন না নিমাই। আড়ষ্ট হয়ে আসে কণ্ঠ। আরও জল এসে দুচোখ প্লাবিত করে দিয়ে যায়।

ওদের অমেয় আনন্দ। হবে না? যে নিমাই পণ্ডিত বৈষ্ণব দেখলে শুরু করে দিত শাস্ত্রীয় তর্ক—করত ওদের পরাজিত, সেই নিমাই যেন মাটির মানুষ হয়ে ফিরেছে। গয়া-স্পর্শ তাঁকে প্রশান্ত করেছে। এনে দিয়েছে পরম ভাবের বন্যা। সেই প্রাণখোলা হাসি এখন আর নিমাই হাসে না। করে না বিদ্রূপ, কৌতুক। করে না শাস্ত্রীয় তর্ক। এ কি হলো? অশ্রু ছল ছল নয়ন। নম্র শান্ত মুখ। দীনতায় আনত। সবার পায়ে যেন চান লুটিয়ে পড়তে। সবার মাঝে খুঁজে ফেরেন তাঁর আপন অন্তরের অধিদেবতাকে।

নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজ পরম খুশী। পরম তৃপ্ত। নিমাইয়ের ভাব-তন্ময়তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছেন তারা। তন্ময় হয়েছেন মুরারি, সদাশিব, শ্রীমান ও শুক্লাম্বর। নিমাই আজ তাদের প্রাণের প্রাণ। হৃদয়ের হৃদিময়। গয়া থেকে নিমাই নির্বেদের দীক্ষা নিয়ে ফিরেছেন। খসে পড়েছে তাঁর সকল আবরণ আর আভরণ। তাই তো ওরা পুলক-মত্ত। আনন্দ-চঞ্চল!

গয়া থেকে নিমাই ফিরেছেন। সংবাদটা রটে গেল বায়ুতে ভর করে। এলো সকলে তাঁকে দেখতে। এলো শিষ্য, সুহৃদগণ। এলেন সনাতন মিশ্রও। সকলের চোখে মুখেই পরম বিস্ময়। পরম জিজ্ঞাসা। তবে কি—তবে কি নিমাই আর সে নিমাই নেই?

অন্তরই জবাব দিল—না, না, না। পণ্ডিত নিমাই, শাস্ত্রজ্ঞ নিমাই বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন ক্ষমাসুন্দর, বিশ্ববন্ধু নিমাই; এসেছেন ভাব-মুগ্ধ কৃষ্ণ-ময় নিমাই। ওঁকি আর সেই নিমাই আছেন? হয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরায়িত। স্ফুরিত হয়েছে আত্মসত্য। আত্মদীপ্তি।

আত্মতনুভা ও আত্মমূর্তি। তাই তো অবিরাম মুখে মাখা কৃষ্ণ কথন। শ্রবণে সুধা ঢালে কৃষ্ণ-কীর্তন। অন্তর যেচে ফেরে কৃষ্ণদর্শন। কৃষ্ণকথা শুনতে শুনতে হারিয়ে যায় বাহ্যজ্ঞান। আবার কৃষ্ণকথাই ফিরিয়ে আনে চৈতন্য। ভাবমত্ত নিমাই। তত্ত্ব, তর্কের পরে যে পরমপুরুষটি রয়েছেন, তাঁকে নিয়ে নিমাই সর্বদা ব্যস্ত।

ওদিকে শচী আকুল। নিমাই এখনও ফিরছেনা অন্দরে। সকলকে নিয়ে মেতে রয়েছে গয়ার কথা নিয়ে। আর বিলম্ব করতে পারলেন না শচী। ডাকলেন নিমাইকে, 'ওরে ও বাবা, জায়গা করেছি যে। চল দুটো খেয়ে নেবে।' একদম ক্ষিদে তেষ্টাও ভুলে গেছ! কৈ, অন্য বারের মত এবারে তোমাকে দেখছি না তো? কোথায় সেই আনন্দ ছন্দ! কোথায় সেই হাসির লহর, গল্পের গমক। 'কি হয়েছে তোমার বাবা?'

শচীদেবীর কণ্ঠ জড়িয়ে এলো। চোখ দুটো হলো ছল ছল। বড় আঘাত পেয়েছেন তিনি। একবারটি প্রাণ খুলে ডাকটি পর্যন্ত নিমাই দেয়নি তাঁকে।

নিমাই বুঝতে পারলেন মায়ের অন্তর দহন। বললেন বিনয়ানত হয়ে, 'দুঃখ করো না মা। পাঁচজন এসেছেন, তাই যেতে পারিনি ভেতরে।'

বলতে বলতেই আবার মনে পড়ে গেল তাঁর গয়ার কথা। একটু তন্ময় হয়ে যেন পড়লেন। বললেন—'আহা, কি দেখলাম মা!'

অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে, বললেন, 'আচ্ছা চল যাই, আগে খেতে দেবে মা। পরে বলব সব কথা।'

আহার পর্ব সমাধা করলেন নিমাই। প্রিয়াকে দিলেন তার প্রসন্ন সান্নিধ্য। কিন্তু শচীর মন তাতেও যেন ওঠেনা।

কি করে উঠবে? তিনি যে দেখেছেন। কি দেখেছেন? দেখেছেন, নিমাইয়ের নয়ন দুটি। এ দৃষ্টির মধ্যে যেন কার আগমন প্রতীক্ষার চাঞ্চল্য। কি যেন খোঁজেন নিমাই। কি যেন নেই। কি যেন এসে ফিরে যায়। তাই শচীদেবীর মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। অধীর হয়ে ওঠেন শচী। মাঝে মাঝেই তাঁর মনটা কেঁদে উঠতে চায়। আবার শান্ত হন। ভাবেন, দু পাঁচ দিন গেলেই ও ফিরে আসবে সহজে, স্বাভাবিকে।

ঈশ্বর-সমীপেও তাঁর কেবল এই একটিই প্রার্থনা—আমার নিমাইকে প্রশান্ত করে দাও! দাও সহজ করে!

কোনো কাজে মন বসে না শচীর। বিষ্ণুপ্রিয়াও উন্মনা। তবুও তার মাঝে শচী শক্ত করে কঠোরে বেঁধে রাখেন নিজেকে। বুঝতে দেন না কিছু প্রিয়াকে। সব কাজ করেও তাঁর অখণ্ড সময়। তাই আজ বসেছেন প্রিয়াকে নিয়ে। বেঁধে দিয়েছেন চুল। সাজিয়েছেন মনের মত করে। যদি প্রিয়ার রূপে নিমাই মুগ্ধ হয়!

কিন্তু এযে শুধুই কল্পনার আকাশে পাখীর পক্ষ বিধুনন, সে কথা তিনি যেন বুঝেও বুঝলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাইয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন শচী উৎকর্ণ হয়ে।

রাত গভীর। ঘুমন্ত নগরী। মাঝে মাঝে ডেকে যায় দু একটি পাখী। ধীরে বইছে বায়ু। আর কোনো সাড়া নেই। শব্দ নেই। সহসা শচী চমকে উঠলেন। চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ শুনে—মা, মাগো, শীগ্‌গির ওঠো মা।'

আকুলতায় ভরা একটি কণ্ঠ। আবার ডাকলেন প্রিয়া, 'মা।'

শচী উঠে পড়লেন। আলো জ্বালবার অবসরটুকু পর্যন্ত নেই। অন্ধকারে দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়ার মুখোমুখী—'কি গো বউমা?'

—'নিমাই কাঁদছে?' কান্নার কণ্ঠে শচীর মনটা একবার কেঁপে উঠল থর থর করে। ত্রস্ত পদপাতে চলে এলেন নিমাইয়ের ঘরে।

এ কি অদ্ভুত দৃশ্য! জ্বলছে একটি তেলের প্রদীপ। নিমাই শয্যায় নেই। নেমেছেন নীচে। বসেছেন মেঝের উপর। আকুল কণ্ঠে অবিরাম কেঁদে চলেছেন।

শচী উদ্‌ভ্রান্ত। পাগলিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিমাইয়ের 'পর। ধরলেন আবেগ-ব্যগ্র বাহুতে তার গলা জড়িয়ে। বললেন কম্পিত কণ্ঠে 'কি হয়েছে বাবা? কেন কাঁদছিস?'

এ কান্নায় বেদনা নেই, আছে এক অপার শান্তি। দুঃখ নেই, আছে তৃপ্তির রসাস্বাদন। বললেন নিমাই—'স্থির হও মা।'

—কেন তোর চোখে জল বাবা?

—না, এ কান্না নয়, সুধা নির্ঝর। 'স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম শ্যামসুন্দর

এসেছে। দাঁড়িয়েছে আমার শিয়রে। বাজাচ্ছে বাঁশী। আহা সে কি রূপ! গলে তার বনমালা। মা, এই তো আমার কৃষ্ণ। আমার প্রাণ-ধন। আমার অন্তর-সুন্দর। তাকে যে আমি ভুলতে পারিনা মা!'

কথা বলতে বলতে নিমাইয়ের কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে এলো। নয়ন দুটি গেল সিক্ত হয়ে। বলতে লাগলেন প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে কৃষ্ণ-কথা।

বিষ্ণুপ্রিয়াও দাঁড়িয়ে। শুনছেন আবিষ্ট অন্তরে। মধুর কথন। শচী ও প্রিয়া দুজনেই তন্ময়। অপলক আঁখি তাঁদের। নিমাইকে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন অভিভূতের মত।

এ কথার কি অন্ত আছে? শেষ আছে? এ যে অশেষ অনন্ত। নীরব রাত্রির নির্জন পরিবেশে তিনটি প্রাণী শুধু জেগে আছেন। আর কেউ নেই। কিছু নেই। কেবল কৃষ্ণ-কথনে মুখর নিমাই পণ্ডিতের গৃহ।

রাত গভীর। ঘুম নেই বিন্দু নয়নে। শচীদেবী ছেলের পানে তাকিয়ে একসময়ে বললেন—আজ বাবা একটু ঘুমোও এখন। কাল আবার শুনব তোমার কাছে বসে কৃষ্ণ-কীর্তন।

মায়ের কথা রাখলেন নিমাই। শুয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাতের পর রাত কাটতে থাকে। কৃষ্ণ চিন্তায়ই চৈতন্য হারিয়ে যায় তাঁর। বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে চোখ মোছেন।

দিবসে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আসড় মেলে। ভক্তগণ এসে মিলিত হন। শুরু হয় কৃষ্ণ-কীর্তন। নিমাই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। শিষ্যদের ডেকে বলেন—'ভাই সব, আমাকে দিয়ে আর কোনো আশা নেই তোমাদের। যা হবার হয়েছে। কৃষ্ণ ভিন্ন আমি যে আর কোনো পাঠ দেখছিনা। কৃষ্ণ ছাড়া সবই যে মিথ্যা। একমাত্র কৃষ্ণই সকল পাঠের সার সত্য। যদি এতে তোমাদের মন তুষ্ট না হয়, তবে অন্য গুরুর স্মরণ লও, ভাই।'

টোলে বসে পড়াতে পারেন না ছেলেদের। পড়াতে পড়াতে কোথা থেকে এসে যেন কোথায় পড়েন। সেই কৃষ্ণ আবেশে অবশ হয়ে যায় তাঁর দেহ। মন মুখর হয়ে ওঠে। আকুল সুরে—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বলেন—তোমরাও আমার কৃষ্ণের স্মরণ লও ভাই। বলো, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে কৃষ্ণনামে মুগ্ধ হয়ে যান। যান অতলান্বিত হয়ে। এ যে মধুক্ষরা। সুধা সিন্ধু। যত বলবে তত মাতবে।

নদীয়া-খ্যাত অধ্যক্ষ নিমাই পণ্ডিতের টোলের দুয়ার ক্রমে বন্ধ হয়ে এলো। সকলে মেতে উঠলেন কৃষ্ণরসে। কিন্তু এ ভাবান্তর শচীদেবী সইতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার যৌবন-দীপ্ত তনু যায় বিশীর্ণ হয়ে। দীর্ঘ-শ্বাসে প্রশস্ত বক্ষ যেন তার চুপসে যেতে চায়। ঘরেই আছেন নিমাই। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর দিগন্তের পরপারে। কোন অসীমে যেন হারিয়ে যায় তাঁর সজীব সত্বা। নিরবধি যেন কি খুঁজে ফেরেন। লোকে বলে—এ নিশ্চিত বায়ু রোগ। ওকে ঘরে তালা বদ্ধ করে রাখো। মাথায় দাও বিষ্ণু তেল। কিন্তু ভক্তগণ বুঝতে পারেন নিমাইয়ের যথার্থ রোগটি কি। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, প্রভৃতি নিমাইয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের অন্তর-আরাধনার প্রেমসুন্দরকে। এ যে স্বয়ং ভগবান! কিন্তু শচীর বক্ষ যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়।

লোকের কথায় এবং নিমাইয়ের মত্তপ্রেমের বিকারে প্রিয়ার মনটাও দিন দিন ভেঙ্গে যাচ্ছে। একদিন তিনিও এসে বেদনাকরুণ কণ্ঠে বললেন শাশুড়ীর কাছে—'মা, ওঁকে ভালো কবরেজ দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।' শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন।

ব্যাকুল শচী শুধালেন পুত্রকে—'ওরে বাপ, এমন হলি কেন?'

আনত মস্তকে বললেন নিমাই—'তাই তো মা. কেন যে এমন হলেম বুঝি না। কৃষ্ণ ছাড়া যে আমার আর কিছু ভালো লাগে না। মন প্রবোধ মানে না। বল মা, এখন আমি কি করি?'

দুর্ভাগ্য শচীর। সব হারিয়ে তাঁর নিমাই। সেও আজ শুনতে পেয়েছে পাগলকরা কালার বাঁশী। ঘরে মন নেই। নেই বিন্দু আসক্তি। তবে কি নিমাইও আমার—আর ভাবতে পারেন না শচী। দুচোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। অন্তর-বেদনার বিলাপ নিবেদন করেন বড় দুঃখে ঈশ্বর সমীপে—

'স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর! নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥

অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর।
সুস্থ চিত্তে গৃহে মোর রহুক বিশ্বম্ভর॥

হে কৃষ্ণ, স্বামী নিয়েছ। পুত্র নিয়েছ। নিয়েছ কত সন্তান-সন্ততি। সব হারিয়ে পেয়েছি আমার নিমাইকে। অনাথিনীর একটি ভিক্ষাও কি মঞ্জুর করতে নেই? হে কৃপাকঠোর, তোমার একবিন্দু করুণা বর্ষণ হোক। বিশ্বম্ভরকে নিও না। তাকে আমার কোলে রাখো!

কত প্রচেষ্টা। কত আশা শচীর। হয়ত ঐ নবীনা বধূর রূপে বিমুগ্ধ হবে নিমাই। তাই তো প্রিয়াকে নিজের হাতে সাজান শচী। মনের মতন করে রূপসীর রূপের চর্চা করে পাঠিয়ে দেন নিমাইয়ের কাছে। কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা। নিমাই কোথায় টেনে নেবেন যৌবন-উন্মিল প্রিয়াকে কোলে, তা নয়—দিতে বসেন দীর্ঘ উপদেশ। বলেন সংসার অনিত্য। কখনও ওঠেন বিকট গর্জন করে। ভয় পান বিষ্ণুপ্রিয়া। কেঁপে ওঠে তাঁর কোমল বক্ষ। তবুও বিরাম নেই প্রিয়ার সেবার। তিনি ভীত ত্রস্তভাবে বসেন স্বামীর পায়ের কাছে। পাখা নিয়ে বাতাস করেন। করেন পদ-সম্বাহন।

কখনও বা দু-একটি কথা বলতে চান মৃদু কণ্ঠে। কিন্তু তার জবাব বড় মর্মান্তিক। নিমাই স্পষ্ট বলেন প্রিয়াকে—'আমার এখন আর কোনো কথা শোনার বা বুঝবার সাধ্য নেই। কৃষ্ণ নাম করো। আমায় শীতল করো তুমি কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে।'

প্রিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন, 'আমি কেবল তোমার নামই জানি গো। তোমাকেই চিনি। আর তো কিছু জানি না। তুমি শান্ত হও। তুমি যে মাকে এত ভালবাস, ভক্তি করো, মায়ের কত দুঃখ তা কি তুমি বোঝ না?'

নিমাইয়ের কণ্ঠে নিরাসক্তির উক্তি, 'মাকে রক্ষা করবেন কৃষ্ণ।' মা তো ভুবন ছাড়া নয়। যিনি বিশ্বপতি, জগৎ-স্বামী, তিনিই দেখবেন আমার মাকে। ওরে, তাঁর দৃষ্টি সর্বত্র। তার সান্নিধ্য থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ!' বলতে বলতে নিমাই নিথর হয়ে পড়েন।

সমুদ্র শিয়রে দ্বীপ-স্তম্ভের মতো বিষ্ণুপ্রিয়া থাকেন জেগে। জেগে থাকেন রাতের পর রাত।

ভোর হলো। পূর্ব দিগন্তে পড়ে আলোর শিখা। পাখী ডাকে। নিমাই জেগে ওঠেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেন। গৌরসুন্দরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে সর্বথা লাভ হয়। এসো আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি।'

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লঞা॥
আপনে কীর্তন নাথ করয়ে কীর্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥'

সবছেড়ে গৌর সুন্দর কৃষ্ণনামে মত্ত হয়ে উঠলেন। নদীয়ার নগর-জীবনে এলো নব প্লাবন। আনন্দের রস বন্যায় ভেসে গেল সব মালিন্য। সব ব্যভিচার। বৈষ্ণবগণ পরম তৃপ্তিভরে গৌর ভগবানকে নিয়ে সঙ্কীর্তনের সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন।

কিন্তু শচী ও প্রিয়ার কি অবস্থা? তাঁদের কান্না-করুণ কণ্ঠেও কীর্তনের সুর। কিন্তু সে সুর বড় বেদনার! বড় হতাশার!

॥ আঠেরো ॥

'কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি শ্রীপাদ?'

'আমি খুঁজছি আমার কৃষ্ণকে!'

সেই প্রেমময়, রসময়, গোপীবল্লভ কৃষ্ণ কোথায়? কোথায় আমার সেই হৃদিময় অন্তরসুন্দর?

'তাঁকে এখানে পাবে কোথায়?'

তিনি তো এখানে নেই।

—তবে? তবে কোথায় পাবো তাঁকে! কোথায় পাবো সেই বনমালী বংশীধারী ব্রজনাথকে? তুমি দেখেছো তাকে?

—দেখেছি।

—দেখেছো! কোথায় আমাকে বলে দাও! প্রগাঢ় আগ্রহে নিত্যানন্দ তাকালেন ঈশ্বরপুরীর পানে।

ভক্তের আকুলতায় পুরীর প্রাণ হলো দ্রাবিভূত। জানালেন নিতাইকে কৃষ্ণের সন্ধান। বললেন, 'তাঁকে পেতে হলে চলে যাও নবদ্বীপে। সেখানে তিনি শচীদেবীর গর্ভে করেছেন জন্মগ্রহণ। এসেছেন নররূপে। নাম নিমাই পণ্ডিত।'

বৃন্দাবন থেকে নিতাই ছুটলেন নবদ্বীপের পথে। এ যেন সাগর-সঙ্গমে চলেছে অধীর উদধি।

নদীয়ার নন্দন আচার্যের ঘরে নিমাই খুঁজে পেলেন তাঁর পরম ভক্ত নিতাইকে। বত্রিশ বছরে নিতাইকে দেখে নিমাইয়ের মনে পড়ল বলরামের কথা। এ যে বলরামের অবতার। দুই মহাসমুদ্রের মহামিলনে নদীয়ার ঘরে ঘরে ডাকল কৃষ্ণ-কালিন্দীর বান। কিছুদিন পড়ে এসে আবার যোগদিলেন ভক্তবৈষ্ণব হরিদাস। অদ্বৈতকে নিমিত্য করে হরিদাস পেলেন নিত্য সত্যের সন্ধান।

নবদ্বীপে মহাসম্মেলন। খোল, করতাল আর মৃদঙ্গ বেজে উঠল ঘরে ঘরে। কৃষ্ণনামে মুখর হলো চতুর্দিক। যে কৃষ্ণের নাম করে, সেই হয় বর্ণশ্রেষ্ঠ। নিমাই দুবাহু প্রসারিত করে তাকে টেনে নেন বক্ষে। বাইশ তেইশ বছরের নিমাই, কিন্তু তাঁর বিস্তার ভুবন বিসারী। তাঁর নামের সৌগন্ধে আদিগন্ত প্লাবিত। সুদূর চট্টগ্রাম থেকে ছুটে এলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌরাঙ্গ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বললেন, 'পুণ্ডরীক এসেছো, এসো ভাই। তোমার বিরহে আকুল হয়ে উঠেছিলাম। তোমাকে পেয়ে আজ প্রাণ শীতল হলো।'

প্রভূর আনন্দ অপরিসীম। নদীয়া হাবুডুবু খেতে লাগল নাম-প্রেমের রস বন্যায়। শুধু নদীয়ায় কেন? সারাটা বাঙলার ঘরে ঘরে এসে প্রতিহত হলো সে তরঙ্গ। চঞ্চল হয়ে উঠল প্রতিটি পল্লী—প্রতিটি নগরী। প্রতিটি মানুষের অন্তর। হবেনা কেন? তারা এতদিন যে মনের মানুষটিকে খুঁজেছে, তিনি যে এসেছেন। এসেছেন নদীয়া নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, নরহরি, মুকুন্দ, গঙ্গাদাস, চন্দ্রশেখর, জগদানন্দ, মাধব, গোবিন্দ, হরিদাস, পুণ্ডরীক, বক্রেশ্বর, সারঙ্গ,

বাসুঘোষ, দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গের 'স্বরূপ' সাক্ষাত। বললেন—তুমিই সেই আদির অনাদি। তুমিই সেই জীবের জীবন। স্বয়ং ভগবান। তোমাকে প্রণাম। তোমাকে প্রণাম।

সেদিন ঘটল এক কাণ্ড। স্নানাহ্নিক সমাপন করে নিমাই চলে এসেছেন শ্রীবাসের বাড়িতে। বসে করছেন কৃষ্ণ কীর্তন। পরিবৃত ভক্তগণ। সহসা আবেশ হলো। আবেশ হলো নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গে। চোখে মুখে প্রকাশিত হলো এক অপার্থিব করুণা। সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ জ্যোতি। ভাবে বিভোর নিমাই। ডুবে গেছেন মধুরে। প্রকাশ হয়ে পড়েছে তাঁর স্বরূপ।

সহসা আরোহণ করলেন বিষ্ণুখট্টায়। তটস্থ ভক্তবৃন্দ। নির্বাক। সমস্ত দেহ প্রাণ তাঁদের রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কি দেখছেন তারা? দেখছেন প্রভুর অপার্থিব বিশ্ববিমোহন রূপ। দেখছেন তাঁর ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ। খট্টায় বসে নিমাই আদেশ করলেন সকলকে—তোমরা কীর্তন করো!

তখন ভক্তদের অন্তর আনন্দে নৃত্য করে উঠল। তাঁরা আত্মহারা। কীর্তনের সুর-সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রাণঢালা কণ্ঠে অন্তরের অজস্র ভক্তি নিবেদন করে মিলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—'জয় প্রভু গৌরাঙ্গ!'

অভিষেক হলো প্রভুর। শত শত গাগরী ভরে আনলেন ভক্তবৃন্দ। করালেন নিমাইকে স্নান। চন্দনে চর্চিত করলেন প্রভুকে। পরিয়ে দিলেন মালা। বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ। প্রত্যক্ষ ভগবানকে নিয়ে লীলামত্ত ভক্তগণ। বারে বারে হুলুধ্বনি করতে লাগলেন পুরললনাবৃন্দ। নদীয়া তীর্থ হয়ে উঠল। নেমে এলো স্বর্গ মাটিতে। দলে দলে লোক আসতে লাগল। হাতে তাঁদের প্রভুর নৈবেদ্য। উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য। ওরে, এরূপ আর কখনো দেখেনি কেউ। শচীদেবীকে ডাকতে পাঠালেন অদ্বৈত ও শ্রীবাস। পাঠালেন একটি লোক। আহা পুত্রের এ 'মহা-প্রকাশ' জননী দেখবেন না!

ব্যাকুল শচী ছুটে এলেন শ্রীবাসের বাড়িতে। ঢুকলেন এসে পূজার ঘরে, সঙ্গে শ্রীবাসের স্ত্রী সখী মালিনী।

কি দেখছেন শচী? কেন তিনি অপলক, স্থির, শান্ত? কেনই বা তাঁর সমস্ত মন প্রাণ আকুল হয়ে গিয়েছে পুত্রদর্শনে?

শচীদেবী দেখছেন তাঁর নিমাইকে। না, এতো নিমাই নয়, এ যে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান!

শচীর অন্তর থেকে তিরোহিত হয়ে গেল বাৎসল্যভাব।

মন ভরে গেল ভক্তি ও প্রেমের সমুদ্র উচ্ছ্বাসে। বুঝিবা অলক্ষ্যে যুক্ত হয়ে গেল তাঁর করপল্লব। মালিনীকে নিয়ে শচীদেবী গৌরাঙ্গমন্দিরে আরতি করতে লাগলেন।

'পঞ্চদীপ জ্বালী তি হ আরাত্রি করিল।
নির্মঞ্জন করি শির ধানদূর্বা দিল॥'

আরতি হয়ে গেল। নিমাই ইঙ্গিত করলেন ভক্তদের। কি? মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। তাই করলেন ভক্তবৃন্দ। শচীদেবী এলেন বাড়িতে। কিন্তু তাঁর মন থেকে সব দুঃখ, সব বেদনা যেন ধুয়ে মুছে গেল। কে করবে নিমাইকে পাগল? নিমাইয়ের জন্যেই আজ সকলে পাগল হয়েছে।

প্রভু গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, 'শ্রীবাস। আমার শ্রীধর কোথায়? শ্রীধর! তাকে নিয়ে এসো।'

শ্রীবাস বললেন, 'শ্রীধর কে, প্রভু?'

নিমাই বললেন, 'বড় দরিদ্র। কিন্তু বড় সজ্জন। নিত্য আমাকে কলার পত্র ও খোলার পাত্র যোগায় শ্রীধর।'

শ্রীধর এলেন। প্রভু ডাকলেন তাকে, 'শ্রীধর, তোমার দারিদ্র আমি রাখবনা। তোমাকে দান করব আজ অষ্ট সিদ্ধি।'

শ্রীধর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, ও, তুমি আর কাউকে দাও প্রভু।' অষ্টসিদ্ধি নিয়ে আমি কি করব?

—তবে তুমি কি চাও?

'কিছু না। আমার দরিদ্র থাকাই ভালো।' কেবল জন্মজন্মান্তর তুমি থেকো আমার হৃদয় জুড়ে। আর কোনো প্রার্থনা নেই প্রভু!

প্রভু খুশী হলেন। তাঁর দরিদ্র শ্রীধরের অন্তরকে অভিব্যক্ত করলেন ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে। বললেন—কৃষ্ণ তোমার প্রতি কৃপা করবেন।

এবারে প্রভু ডাকলেন—'মুরারি!'

'প্রভু'। যুক্ত করে এসে মুরারি দাড়ালেন প্রভুর সম্মুখে। তাকিয়ে রইলেন অধীর প্রতীক্ষায়।

বললেন প্রভু—'তুমি আমার বড় প্রিয়। তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি। এবারে ছেড়ে দাও তুমি অধ্যাত্মচর্চা। প্রেম ধর্মের দীক্ষা নেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কাছে।'

একটু সাহসে ভর করে মুমারি শুধালেন, 'কেন প্রভু, অধ্যাত্মচর্চা কি ভালো নয়?'

'ভালোমন্দের কথা নয় মুরারি। যদি পেতে চাও সচ্চিদানন্দন প্রেমময় বিগ্রহ—তবে প্রেমের পথই যে প্রশস্ত মুরারি।'

বেশ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন মুরারি। প্রভু ডাকলেন—'মুরারি, আমার পানে তাকাও। কি দেখছ?'

শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক মুরারির যেন মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। আনন্দ-বিহ্বল মুরারি তাকালেন বিষ্ণুখট্টার পানে। না, না, এতো গৌরাঙ্গ নন—এ যে সেই নয়নাভিরাম নবদুর্বাদল শ্রীরামচন্দ্র। মুরারি বিষ্ণুখট্টার সম্মুখে হলেন আভূমি প্রণত।

'হরিদাস'। প্রভু ডাকলেন মধুর কণ্ঠে।

হরিদাস সতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন।

প্রভু বললেন, 'তুমি বর মাগো হরিদাস।'

হরিদাস মাগলেন, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে—'আমাকে করো অভিমান শূন্য। মালিন্য মুক্ত। আমাকে দীন করো প্রভু। আমার যেন লাভ হয় তোমার এবং তোমার ভক্তের করুণা। শুধু এই আমার ভিক্ষা। আর কিছু কামনা নেই প্রভু।'

'ধন্য হরিদাস।' ভক্তগণের কণ্ঠে ফুটে উঠল জয়ধ্বনি। প্রভু বললেন হরিদাসের পানে তাকিয়ে, 'সার্থক হোক তোমার জীবন হরিদাস।'

সবাইকে ডাকলেন প্রভু। কিন্তু একজন রইলেন অবশেষে। কে তিনি? মুকুন্দ। কেন প্রভু তাঁকে ডাকলেন না? মুকুন্দ মরমী প্রেমিক ভক্তদের ঘৃণা করেন। করেন নিন্দা। পণ্ডিতদের দলে ভিড়ে মাঝে মাঝে মুকুন্দ করেন তাঁদের সমালোচনা। তাই প্রভু বললেন, 'মুকুন্দকে অপেক্ষা করতে হবে কোটি জন্ম।'

বাইরে বসেছিলেন মুকুন্দ। কথাটি গেল তাঁর কানে। একটু বেদনা নেই। বিমর্ষ হলেন না মুকুন্দ। আনন্দে তাঁর হিয়া নৃত্য করে উঠল। বললেন মুকুন্দ, 'হোক কোটি জন্ম, তবুও পাব তো! আমি কোটি জন্মই অপেক্ষা করবো তোমার কৃপাপ্রার্থী হয়ে।'

এদিকে প্রভু শুনতে পেলেন মুকুন্দের প্রত্যয় দৃঢ় মনের ঐকান্তিক উক্তি। মুকুন্দ ভক্ত। কিন্তু মাঝে মাঝে ঘটে তাঁর মতিভ্রম। প্রভু আর পারলেন না ভক্তের অদর্শনে থাকতে। ডাকলেন আনন্দ মধুর কণ্ঠে, 'মুকুন্দ ভেতরে এসো।'

মুকুন্দ এলেন। প্রভু তাঁর পানে তাকিয়ে বললেন—'ওগো, তোমার প্রতি আমি কি বিরূপ হতে পারি! কেবল পরীক্ষা করছিলাম তোমাকে।'

আজ নিমাই কল্পতরু। যে যার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করে ধন্য হতে লাগল। ক্রমে রাত এলো গভীর হয়ে। ক্লান্ত অবসন্ন ভক্তবৃন্দ। আর যেন তাঁরা সহ্য করতে পারছেন না শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য রূপ। তাঁর তেজ-তপ্ত কটাক্ষে, তাঁর শক্তির প্রাবল্যে ভক্তবৃন্দ বিহ্বল, বিমূঢ়। অনেক কষ্টে বললেন তাঁরা, বললেন তাঁদের প্রিয় প্রভুর পানে তাকিয়ে, হে কৃপাময়, হে ক্ষমা সুন্দর, আমরা ক্ষুদ্র, আমরা দীন, কি করে সহ্য করবো তোমার তেজদীপ্তি। এবারে তুমি সহজ হয়ে ধরা দাও। ধরা দাও জননী শচীর দুলাল বেশে। সম্বরণ করো তোমার তেজ।

ভক্তদের অকুল আকুতি নিমাইকে টেনে নিয়ে এলো সহজে। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। একেই বলে প্রভুর 'সাতপহরিয়া প্রকাশ।' দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ-আবেশে প্রভু ভগবান হয়ে ভক্তদের মনের বাসনা পূর্ণ করলেন।

ওদিকে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। সমস্ত দেহে যেন মৃত্যুর স্পষ্ট ভাব প্রকট হয়ে উঠল। ভক্তদের নয়নে এলো জল। তারা যে যার মুখ পানে তাকাতে লাগলেন—তবে কি, তবে কি প্রভু আমাদের ছেড়ে বিদায় নিচ্ছেন?

আর কোনো পথ ও পন্থা না পেয়ে অদ্বৈত কাতর কণ্ঠে গান ধরলেন কুঞ্জভঙ্গের 'ওঠো ওঠো গোরাচাঁদ, নিশি পোহাইল।'

দীর্ঘ সময় হলো অতিক্রান্ত। প্রভু এবারে তাকালেন চোখ মেলে। আশ্বস্ত হলেন ভক্তগণ। ফেললেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

তরুণ নিমাই আজ মানুষের অন্তরের সম্রাট। হৃদয় রাজন। প্রাণের ভগবান। নদীয়ার দিকে দিকে এ সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। আসতে লাগল দলে দলে লোক। হরিনামের বাণ-বন্যায় নদীয়া ভেসে যেতে বসল।

একি বিভ্রাট! অভক্ত দুষ্ট ব্যক্তিদের অন্তরদহন সৃষ্টি করল কৃষ্ণ নাম। তাদের হৃদয়ের পাপবৃত্তিগুলো নাম ভীতিতে আরও হিংস্র কপট হয়ে উঠল।

জগাই, মাধাই দুই রাজকর্মচারী। মদ খায়। করে পাপাচার। নরহত্যায় তাদের বিন্দু কুণ্ঠা নেই। কু-কর্মই তাদের প্রাধান বৃত্তি। জীবনের চরম ও পরম বলে বেছে নিয়েছে তারা মানুষের অহিত সাধন। জগাই আর মাধাইকে নবদ্বীপে কে না চেনে? ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও এরা পাষণ্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ। নবদ্বীপের সন্ত্রাস।

হরিদাস আর নিত্যানন্দের 'পর পড়েছে নাম প্রেম প্রচারের ভার। সন্ধ্যা-সমাচ্ছন্ন নদীয়া। প্রেম-মত্ত নিতাইয়ের কণ্ঠে সুধা নির্ঝর হরি গুণগান। চলেছেন প্রভুর গৃহাভিমুখে। পথে সাক্ষাৎ হলো দুই মাতালের সঙ্গে। তারা দাঁড়াল নিত্যানন্দের পথ আটকে। কোনো ভয় নেই, ভীতি নেই, নিত্যানন্দ আনন্দে অধীর। বললেন, একবার প্রাণভরে হরি বলো ভাই। বলো ভাই জগাই-মাধাই, ভজহরি, জপহরি, লহ—'

আর কথা বলতে পারলেন না নিত্যানন্দ। একটা ভাঙ্গা কলসীর কানা দিয়ে ক্রোধান্ধ মাধাই আঘাত করল নিত্যানন্দের মাথায়। ঘটল অঘটন। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

"ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ঝরে।
'গৌর' বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥"

মাধাই মত্ত মাতাল। তার ক্রোধ পড়ে না। আবার তুলে আনল

একটি ভাঙ্গা কলসীর খণ্ড। এগিয়ে গেল নিতাইকে আঘাত করতে। কিন্তু এবারে জগাই ধরল তার হাত চেপে—'ছিঃ ছিঃ কি করছিস মাধা...'

নিত্যানন্দ তখনও অবিশ্রান্ত গেয়ে চলেছেন—

"মেরেছিস মেরেছিস তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম বল মুখে ভাই॥"

অঝোরে রক্ত ঝরছে নিত্যানন্দের মস্তক থেকে। সংবাদটি পৌঁছল গিয়ে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে। তিনি ত্রস্ত পদপাতে ছুটে এলেন। নিত্যানন্দের অবস্থা দেখে প্রভু যেন আর স্থির থাকতে পারলেন না। দ্রুত পদ বিক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ালেন মাধাইয়ের কাছে। বড় বেদনায় ও ক্রোধে বলতে লাগলেন—'ওরে, তোদের যদি এতই রক্তের ক্ষুধা, তবে আমাকে মারলে না কেন। আমিই তো অপরাধী। কেন তোরা মঙ্গলকামী সন্ন্যাসীর রক্তপাত করলি।'

প্রভু তখন থরথর করে কাঁপছিলেন। আর যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না নিজেকে। অধর্মের বিনাশকল্পে প্রভু স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এ যেন সেই অধর্মনাশন শ্রীকৃষ্ণের রুদ্র দীপ্ত মূর্তি। কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হতে লাগল—'চক্র, চক্র, কোথায় চক্র, আমার সুদর্শন।'

ভীত ত্রস্ত নিতাই শিউরে উঠলেন। আবেগ আকুল কণ্ঠে জেগে ওঠে প্রার্থনার কাতর মিনতি—'প্রভু, প্রভু শান্ত হও প্রভু। অবোধ মাধাইয়ের শক্তি কোথায় এই করুণার বেগ সহ্য করে? মাধাই আমাকে মেরেছে। কিন্তু জগাই তার বড় ভাই রেখেছে আমাকে তার বুকের আড়ালে লুকিয়ে।'

জগাইকে কোল দিলেন প্রভু। মাধাইও এসে পড়ল প্রভুর চরণ প্রান্তে। জীবনের মহতী প্রকাশ হলো। ঘুচে গেল এত দিনের পাপ তাপ সব কিছু। চেত দর্পণে প্রকীর্ণ হলো সত্যসুন্দরের তনু দীপ্তি। জগাই মাধাই একসঙ্গে গেয়ে উঠল হরিবোল, হরিবোল।

চোখের জলে ধুয়ে গেল তাদের আত্মগ্লানীর অন্ধকার। কিন্তু নবদ্বীপের লোক হলো বিস্মিত। যারা ছিল ঘোর পাপী, নবদ্বীপের দুষ্টগ্রহ

তারাও হয়ে গেল হরিভক্ত। গৌরগত প্রাণ। শুরু হলো নবদ্বীপে নগরকীর্তনের ঐতিহাসিক অভিযান। ভগবদ্দ্বেষী পাষণ্ডের দল যেন আর সহ্য করতে পারছে না। তাদের হলো গাত্রদাহ। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরের অহিত যাদের দিবস-নিশিথের চিন্তা, তারা কেমন করে সহ্য করবে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা। তাই আর কোন পথ না পেয়ে এবারে গিয়ে আশ্রয় নিল রাজশক্তির।

প্রতাপপ্রবল রাজা চাঁদকাজী। গৌরের বাদশা হুসেন সাহেবের দৌহিত্র চাঁদ। তিনি যে এ কীর্তনের সংবাদ না রাখতেন তা নয়। কিন্তু তাতে হস্তক্ষেপ করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের প্ররোচনায় পাঠান শাসনকর্তা চাঁদকাজী এ বিষয়ে একদিন মনোযোগী হয়ে উঠলেন। মনোযোগী হয়ে উঠলেন দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুদের নালিশ শুনে।

'আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥'

সমস্ত নদীয়া নগরে নেমে এলো সন্ত্রাসের বিভিষীকা। কাজী বললেন, 'আমার নিষেধ শুনেও কার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করছিস? অদ্য এই পর্যন্ত করে ক্ষান্ত দিলেম। আর যদি নগরে কেউ হরিনাম করে, তবে তার জাত মারা যাবে।'

ভক্তগণ অনন্যোপায়। গিয়ে হাজির হলো প্রভুর সমীপে। প্রভু বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে কীর্তন করো। যদি কেউ বাধা দেয়, আমি তাকে দণ্ড দেব।'

কিছুটা আশ্বস্ত হলো নাগরিকগণ। কিন্তু তবুও মনের নিভৃতে তাদের ভীতির ভাবনা। কেনই বা হবে না? কাজী যে রোজ রাত্রে সৈন্য নিয়ে ঘুরে বেড়ান নগরে নগরে। কীর্তন হচ্ছে শুনলে কি আর রক্ষা আছে। ফলে হলো কি? ক্রমে হরি-সঙ্কীর্তন একরকম বন্ধ হয়েই গেল।

কিন্তু কীর্তনপ্রিয় নাগরিকগণ নাম-বিরহে বিক্ষুব্ধ। কি করে বেঁচে

থাকবে কীর্তন না করে। প্রভুর কাছে এসে বলল তারা। কি বলল? 'প্রভু! আমরা কীর্তন করতে পারছিনা। তুমি অমাদের বিদায় দাও। চলে যাই অন্য দেশে।'

কথাগুলো আঘাত করল প্রভুর অন্তরে। কঠোর কঠিন হয়ে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সত্য কেন চিরদিন হবে পরাভূত? কেন ধর্মকে বিধ্বস্ত করবে অধর্ম। না, না, না—তা হতে পারে না। অগ্নিদীপ্ত রুদ্রমূর্তিতে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন, 'বটে, কাজী করবে কীর্তন বন্ধ? শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন? তবে আগে আমাকে বধ করুক। আমি আজ নগরে নগরে কীর্তন করবো। চূর্ণ করবো কাজীর দর্প। আজ আমি প্রেমবন্যায় নদীয়া ভাসাব।'

দর্পহারী শ্রীহরি গৌরাঙ্গ সুন্দর ডাকলেন নিত্যানন্দকে। বললেন, 'শ্রীপাদ, তুমি ঘোষণা করে দাও নদীয়ার ঘরে ঘরে, আজ সন্ধ্যায় আমি কীর্তন করবো নগরে নগরে। শোন, আরও বলবে—আহারান্তে অপরাহ্নে সকলে এসে মিলবে আমার বাড়িতে। প্রত্যেকে যেন একটি করে মশাল নিয়ে আসে।'

নাগরিকদের পানে তাকিয়ে বললেন শ্রীগৌরাঙ্গ, 'তোমরা ভয় করো না। আমার এ আজ্ঞা সর্বত্র ঘোষণা করে দাও। বলো, সন্ধ্যায় বের হবে নগর-সঙ্কীর্তন।'

নবদ্বীপে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। সমস্ত নদীয়া নগরের মানুষের বক্ষে যেন সঞ্চার হলো বিদ্যুৎ-শক্তি। আজ আর কৃষক মাঠে গেল না। বালক বৃদ্ধ ত্যাগ করল আহার। নারীগণ অবসর নিল সংসার কর্ম থেকে। আজ আর কোনো কাজ নয়। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিল রাজশক্তির বিরুদ্ধে শতস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের আনন্দে। দুর্বল জনশক্তি আজ এই প্রথম জানতে শিখল স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতে—আইন অমান্য করতে। মা পরিয়ে দিলেন পুত্রের গলায় ফুলের মালা। স্ত্রী স্বামীকে সাজিয়ে দিল শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সমরে যাত্রা করবার জন্যে। সে কি পরম মুহূর্ত, পরম লগন নেমে এলো নদীয়ার ঘরে ঘরে।

সন্ধ্যা ক্রমে এলো ঘনিয়ে। নবদ্বীপের পথে অগুণতি লোক। জীবের

জনতায় আজ বিপ্লবী গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ করবেন আত্মপ্রকাশ। তাই সকলে এসেছে দেখতে। শত্রু মিত্র সবাই উৎসুক। সকলের বক্ষেই উৎকণ্ঠা যেন আজ কি হয়!

এসেছেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস। এসেছেন শ্রীবাস, শুক্লাম্বর, মুরারি—নরহরি ও মুকুন্দ। প্রভু এখনো বাইরে আসেননি। গদাধর তাঁকে মনের মতন করে সাজাচ্ছেন। আহা কি রূপ। এ যেন বিশ্ব-বিজয়ী নায়ক। যুদ্ধ-বেশ ধারণ করেছেন। অরুণবরণ পট্টবাস। উত্তরীয়, ফুলের মালা। নয়নে কাজর রেখা। ললাটে চন্দনবিন্দু। গণ্ডে কপালে তিলক। চরণে সোনার নূপুর।

নবদ্বীপের শোভারও কি আজ তুলনা আছে? প্রতি দ্বারপ্রান্তে মঙ্গল কলস। প্রতিটি গৃহে উড়ছে পতাকা। ধূপে, দীপে আমোদিত প্রতিটি কুটীর। দীপে দীপান্বিতা নদীয়া নগর। যেন আলোর আপ্লবে প্লাবিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর জননী শচীর চরণে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন আশীর্বাদ। দেবী আশীর্বাদ করলেন। ললাটে দিলেন আশিস চুম্বন। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর রূপ দর্শন করতে লাগলেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, প্রভুর জয় হোক।

রূপের নাগর শ্রীগৌরাঙ্গ এসে দাঁড়ালেন দ্বারপ্রান্তে। সব নীরব। অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে আছেন সকলে, তাকিয়ে আছেন প্রভুর পানে। দুটি সোনার বাহু তুলে সোনার মানুষ নিমাইচাঁদ একবার বললেন—'হরিবোল!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল হরিবোল। সমস্ত নগর যেন কেঁপে উঠল। জ্বলল মশাল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজ শুরু হবে আলোর অভিযান। তাই তো মশাল জ্বলল। হাজার হাজার মশাল। বেজে উঠল মৃদঙ্গ। করতালির তালে তালে শুরু হলো যাত্রা। মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত নারীকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো হুলুধ্বনি। করলো তারা পুষ্পবৃষ্টি। নাম-প্রেমের অভিযান শুরু হলো। কৃষ্ণপ্রেমের, কৃষ্ণ নামের অমেয় শক্তি বিকাশে আজ মহাপ্রভু নৃত্যরত।

সংকীর্তন চলল এগিয়ে। রাজপথ, জনপথ, পল্লীপথ সর্বত্র তাঁর

অবাধগতি। ভয় নেই, ভীতি নেই, নেই বিন্দু সন্ত্রাস। প্রাণের আনন্দে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে এগিয়ে চলল তাঁরা।

'কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আসনা পাসরি॥
কেহ কেহ নানা মত বাদ্য গায় মুখে।
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কার সনে॥'

'হরিবোল', 'হরিবোল'। লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল কাজীর রাজপ্রাসাদ। চমকিত পাঠান শাসক চাঁদকাজী। তবে কি, তবে কি, ক্রীতদাস হিন্দুরা ঘোষণা করল প্রতাপপ্রবল কাজী সাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? উন্মত্ত চাঁদকাজী। প্রহরীদের হুকুম দিলেন—বন্ধ কর এই হিন্দুদের কলকল্লোল। যেমন করে হোক, আর এক পা এগোতে দিওনা ওদের। এ যেন বজ্রকঠোর আদেশ।

আর কথা নেই। সৈন্য সামন্ত সজ্জিত হলো অস্ত্রে। ছুটে এলো মত্ত উল্লাসে। কিন্তু কি পেল? পেল আঘাতের বদলে প্রেম ও ক্ষমা। পেল কৃষ্ণপ্রেমে আকুল ভক্তদের আবক্ষ আলিঙ্গন। কঠোর কঠিন প্রহরী-মন গেল গলে। হলো নির্গলিত ঝর্ণা। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—হরেকৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! তারা মজে গেল। ডুবে গেল। সারাজীবন যারা করেছে যুদ্ধ, হেনেছে মানুষের বুকে আঘাত—তারাও আজ কৃষ্ণপ্রেমের ছোঁয়ায় ফিরে পেল নবজীবন। খসে পড়ল হাতের অস্ত্র। প্রেমরূপ অস্ত্রের কাছে যন্ত্রযুগ হার মানল।

কীর্তন ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল। ঢুকল একেবারে কাজীর বাড়িতে। মিঞাপুর মশালের আলোতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। কাজীর সমস্ত অহংকার গিয়েছে অপহৃত হয়ে। আজ আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই তাঁর। সব যেন কোথায় উবে গিয়েছে। তখন কীর্তনের মধ্য

থেকে একটা ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল—'মার কাজী' 'মার কাজী।' কাজী সাহেবের ঘর বাড়ি যেন তচনচ করে ফেলবে ওঁরা। ঠিক তখন যুগদীক্ষার নায়ক শ্রীগৌরাঙ্গ ডাকলেন কাজীকে।

ভীত ত্রস্ত কাজী আনত মস্তকে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ালেন করযোড়ে জনগণ-মন-অধিনায়ক শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে। প্রার্থনা করলেন ক্ষমা। তাকালেন চোখ তুলে। কি দেখলেন কাজী? দেখলেন ভগবানের ঐশ্বর্য প্রকাশ। বুঝলেন নিমাই সাধারণ মানব নয়—স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজী প্রতিজ্ঞা করলেন—প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কীর্তনে কোনো দিনও বাধা দিবেন না বলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠেও রণিত ধ্বনিত হয়ে উঠল—'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।'

কীর্তনের ঘোর বিরোধী মুসলমান পাঠান শাসক কাজীও মাথা নত করলেন গৌর সুন্দরের চরণ প্রান্তে। গ্রহণ করলেন কৃষ্ণনাম। কাজী দমন হলো। উদ্ধার পেলেন।

নদীয়ায় সেদিন আনন্দের মহাপ্লাবন বয়ে গেল। গৌরাঙ্গসুন্দর জীবের জনতায় আপনাকে উজার করে বিলিয়ে দিলেন।

* * * *

নদীয়া-লীলা বুঝি প্রভুর শেষ হয়ে এলো।

ক্রমেই কৃষ্ণ-চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন তিনি। দেহ মনে স্ফুরিত হলো রাধা ভাব। গদাধরের গলা ধরে কেঁদে কেঁদে নিমাই বলেন, 'সখি! কই, কৃষ্ণ তো এলো না? তোমরা দেখছনা, এদিকে যে আমার প্রাণ যায়।'

বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। অসার দেহ পড়ে থাকে। দু চোখে নামে বেদনার অশ্রুধারা।

শচীদেবী ছেলের এ ভাব দেখে রোদন করছেন। দুঃখে বেদনায় তাঁর অন্তর যেন ভেঙ্গে যেতে চাইছে। পাগলের মত তাঁর নিমাই আজ কৃষ্ণবিরহে মত্ত। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর প্রাণ বুঝি আর থাকে না। বিষ্ণু-প্রিয়ার সঙ্গে রঙ্গ রস করতেন মাঝে মাঝে। তাও এখন আর করেন না। শচীদেবীর চতুর্দিক যেন মনে হলো শূন্য। শুধু ধু ধু করে মরুর হাহাকার। অথৈ নিঃসীম নীল দিগন্ত বই তাঁর চোখে আর কিছুই আজ হচ্ছে না আভাসিত।

তখনও প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফেরেনি। সকলে চেষ্টা করছেন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সহজে। কিন্তু সকল চেষ্টাই যেন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসল।

এমনি সময় এলেন কেশবভারতী। এলেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে।

থাকেন ভারতী কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে এক বট-প্রচ্ছায়ে। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের সামনে। দেখলেন তাঁর অপার্থিব রূপ। বললেন—এ কে? শুক না প্রহ্লাদ? না না না,—তাঁরা যার ধ্যানে তন্ময় এ বুঝি সেই অনাদি পুরুষ মহান্ত।

ভারতী এলে নিমাইয়ের জ্ঞান ফিরে এলো! প্রগাঢ় আগ্রহে সন্ন্যাসীকে বসালেন নিমাই। ভারতী করলেন আশীর্বাদ। বললেন—কৃষ্ণে মতি হোক!

এদিকে সন্ন্যাসীকে দেখেই শচীর প্রাণ গেল উড়ে। ভয়ে একবার থর থর করে কেঁপে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। হায় হায় কেশব ভারতী বুঝি আমার সর্বনাশ করে যাবে!

গোপনে ভারতীর সঙ্গে নিমাইয়ের যেন কি সব কথা হলো। মুগ্ধ ভারতী। বিদায়ের প্রাক্কালে নিমাইকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

নিমাই আবার ধারণ করলেন পূর্বরূপ। এমনি সময় এলেন তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এলেন নিমাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করতে। একই টোলের ছাত্র দুজনে। নিমাইয়ের ভক্তির কথা শুনেছেন তিনি। শুনেছেন—নিমাই খুব বড় ভক্ত বনে গেছে। তাই একবার সাক্ষাৎ করতে এলেন।

কিন্তু ফল হলো বিপরীত। অন্তর্যামীর কাছে কি আর ছলা খেলা চলে? পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে তিনি এলেন নিমাইকে দু একটি উপদেশ দিতে। প্রভু তখন ভাবে বিভোর। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাঁর। রাধা ভাবে তন্ময় প্রভু।

কে এসেছেন সে খেয়ালও নেই তাঁর। এমনি সময় কৃষ্ণানন্দ বললেন নিমাইকে—তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর। কোনো শাস্ত্রে তো গোপীনাম জপ করবার বিধান নেই নিমাই।

কথাটা বারে বারেই বলতে লাগলেন কৃষ্ণানন্দ। কিন্তু প্রভু মনে করলেন অন্যরকম। ভাবের ঘোরে প্রভু ভাবলেন– নিশ্চয়ই এ লোকটি কৃষ্ণের দূত। কৃষ্ণের হয়ে ভোলাতে এসেছে তাকে। এসেছে নিঠুরালী করতে। না, না, ও নিঠুর কপটের প্রেমে আর মজবেন না প্রভু।

শ্রীমতীর মনে মানের উদ্রেক হয়েছে। রাধা ভাবে বিভাবিত নিমাই যেন রাধা বনে গিয়েছেন। তাই তো মান করে বলছেন— কৃষ্ণ নিঠুর, শঠ, কপট। ও নারীঘাতী। আমি আর ওর নাম মুখে আনবো না।

আগমবাগীশ বুঝতে পারলেন না নিমাইয়ের অন্তরের অতলের সংবাদটি। তাই তো বললেন বিস্ময়াবিষ্টের মত—'সে কি! তুমি এখন কৃষ্ণ ছেড়ে ভজবে গোপী?'

আর সহ্য হলো না রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গের। তিনি একটা লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে গেলেন আগমবাগীশকে। তন্ত্রাচার্য প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে নিমাই সম্বন্ধে জেগে উঠল অন্যভাব, সংবাদটি প্রচার হয়ে গেল দিকে দিকে। তৈরী হয়ে গেল আগমবাগীশের অনুচরবৃন্দ। তারা প্রভুকে মার দিবে বলে করল সাব্যস্ত।

প্রভুর কানে এলো সংবাদটি। নীরবে বসে রইলেন কতক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে ডাকলেন নিতাইকে—'শ্রীপাদ!'

নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বললেন নিমাই— শুনেছ শ্রীপাদ?

শ্রীনিত্যানন্দ সব জানলেও কণ্ঠে তার বাক্য স্ফুরণ হলো না। প্রভু ক্ষীণ বিরতির পরে বললেন বড় বেদনাহত অন্তরে—বড় সাধ ছিল শ্রীপাদ তোমাদের নিয়ে সুখে কাল কাটাব। মনে করেছিলাম, আমি ঘরে থাকলে সকলে আনন্দে থাকবে। কিন্তু না, তা যে সম্পূর্ণ ভুল। জীব তা চায় না। আমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না শ্রীপাদ। কেউ গ্রহণ করবে না হরিনাম। আত্মনিগ্রহের কঠোর যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে আমি জগতে প্রচার করব হরিনাম। 'আমাকে এ সংসার সুখ বিসর্জন দিতে হবে।'

নিত্যানন্দ আঁত্‌কে উঠলেন, 'তবে কি তুমি সন্ন্যাস নেবে প্রভু?'

প্রভুর কণ্ঠ ভার হয়ে এলো। করুণ সুরে বলতে লাগলেন তিনি, এ দেহে কি আর কিছু আছে ভাই? এদেহ কৃষ্ণ বিরহে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমায় ছেড়ে দাও ভাই।'

নিত্যানন্দের দুচোখ বেয়ে নামল অশ্রুর ঝর্ণা। সকলের চোখেই জল। প্রভু তাদের পানে তাকিয়ে বলতে লাগলেন - শুষ্ক সন্ন্যাস ধর্মে আমার বিন্দু শ্রদ্ধা নেই। আমার ঠাকুর প্রেমময়, রসময়, রসের নাগর। তাকে পেতে নিরস সন্ন্যাসের কিছু প্রয়োজন ছিল না। তবুও আমাকে আজ সন্ন্যাস নিতে হবে। তোমরা তো জান শ্রীপাদ, সংসারে থেকেও আমি সংসারের নই। সর্বদা মেতে থাকি কীর্তনে তোমাদের সঙ্গে। মা আমার সঙ্গে কথা বলে পান না সান্ত্বনা। বিষ্ণুপ্রিয়া মাঝে মাঝে পায় আমার দেখা। কিন্তু মানুষ আমার বাইরটাই শুধু দেখলে—সন্ধান নিলে না অন্তরের। আমি দীন দুঃখীর মত কেঁদে কেঁদে ডাকব আমার কৃষ্ণকে। দীনতায় ঝরবে আমার চোখে জল। কাঁদবেন আমার জন্যে আমার মা। কাঁদবে বিষ্ণুপ্রিয়া। সঙ্গে কাঁদবে তোমরাও। আমাদের সকলের চোখে জল দেখে আসবে জীবের চোখে জল। তারাও কৃষ্ণের জন্যে কাঁদতে শিখবে। শ্রীপাদ, নিজে কেঁদে পরকে কাঁদাতে হয়।

নিত্যানন্দ 'প্রভু, প্রভু' বলে আর্তকণ্ঠে কেঁদে ফেললেন। নিমাই একটু তিক্ত মধুর কণ্ঠেই বললেন—'কেন কাতর হচ্ছ, শ্রীপাদ। তুমি স্থির থাকতে না পারলে যে কিছুই হচ্ছে না।'

কণ্ঠ প্রভুর আবার ক্ষীণ হয়ে এলো—'তুমি আছ, শ্রীঅদ্বৈত আছেন, আছেন শ্রীবাস, হরিদাস। তোমাদের পানে তাকিয়েই তো সাহস পাচ্ছি আমি এত বড় ব্রত উদ্‌যাপনে।'

'ভকতের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল।
অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥
গদ গদ স্বর, কথা না বাহির হয়।
সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়॥ চৈঃ মঃ

সকলের পানে তাকিয়ে প্রভু অতি ধীরে ধীরে বললেন "তোমরা শান্ত হও। আমার এ-দেহ তোমাদের। তোমরা আমাকে যেখানে

সেখানে বেচতে পার।…আমাকে তোমরা সর্বদা দেখতে পাবে।… তোমরা যখনই সংকীর্তন করবে, তখনই তার মধ্যস্থলে আমি নৃত্য করব।”

শ্রীবাসের পানে চেয়ে এবারে বলতে লাগলেন প্রভু, “তোমার ঠাকুর-মন্দিরে দেখতে পাবে আমাকে সর্বদা।…যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবেন আমার জননী, কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ,—তিনিই আমাকে দেখতে পাবেন। এই অঙ্গীকার রইল আমার তোমাদের কাছে।’

প্রভু জনে জনে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে। এ বিদায়-বিরহ মর্মান্তিক এবং দুঃসহ হবে বলেই প্রভু ভক্তবৃন্দের কাছে আপন অন্তরবেদনার জ্বালা নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া? তাঁদের কি বলে প্রবোধ দিবেন প্রভু? কি ভাবেই বা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে যাবেন শ্রীগৌরাঙ্গ? সে বড় মর্মান্তিক কাহিনী! বড় বেদনার অধ্যায়!

॥ উনিশ ॥

হাওয়া যেন কয়ে গেল কানে কানে। কয়ে গেল শচীদেবীর কাছে।

কি কয়ে গেল?

—তোমার নিমাই চলে যাচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে। যাচ্ছে জীবনের গৈরিক পথে কৃষ্ণ অভিসারে।

সংবাদটি গোপন রইল না। এক কান দুকান করে অবশেষে বহ্নি-শলাকার মত পৌঁছল এসে শচীর কানে। সকলের মুখেই এক কথা। সকলের বুকেই এক ব্যথা—সোনার গৌর যাবে সন্ন্যাসী হয়ে।

ব্যাকুল শচী! ছুটে এলেন পাগলিনীর মত পুত্রের কাছে। শুধালেন ভীত ত্রস্ত কণ্ঠে, ‘ওরে নিমু, কি শুনছি রে?’

সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধা জননী। শোকে দুঃখে ক্ষত বিক্ষত তাঁর অন্তর। দুটো মায়া-ভীরু অশ্রু-সজল চোখে তাকালেন তিনি। তাকালেন তাঁর নিমাইয়ের পানে।

নিমাই যেন কথা বলতে পারছেন না। কেবল কাতর কণ্ঠে ডাকলেন একবার, 'মা !'

'নিমাই।'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নিমাই বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর। তুমি বৃদ্ধা, শোক-সন্তপ্তা। আমি তোমার একমাত্র পুত্র। কি অফুরন্ত স্নেহে তুমি পালন করেছ আমাকে। নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রেখেছ বুকে। প্রগাঢ় মমতায় রেখেছ ঘিরে। তা আমি বুঝি। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কিন্তু মা—'

কণ্ঠ যেন তাঁর অবরুদ্ধ হয়ে এলো। বুকের মধ্য বিন্দুটায় আছড়ে পড়ল খ্যাপা ঢেউ। মনের সব কথা যেন হারিয়ে যায়। ফুরিয়ে যায়। নিমাই তাকাতে পারেন না মায়ের মুখের পানে। ক্ষণ বিরতি। ডাকলেন নিমাই তাঁর পাগল-করা কণ্ঠে আবার—'মা !'

জননী শচী পুত্রের পানে তাকিয়ে আছেন অপলক নয়নে। নিমাই তাঁর বেদনরুদ্ধ হৃদয়ের মমতা ঢেলে বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার অক্ষম সন্তান। এ জন্মে পারলাম না তোমার ঋণ শোধ করতে। কোটি জন্মের চেষ্টায়ও তা আমি শোধ করতে পারব না। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম পুত্র জন্মে। মা, আমি তোমার তেমনি এক সন্তান। তোমার কোনো কাজেই লাগলেম না আমি। হলো না আমাকে দিয়ে তোমার সেবা, তোমার প্রতিপালন।"

'ওরে—ওরে নিমাই,' ওসব কি বলছিস তুই ? ওরে আমার নবদ্বীপ-চন্দ্র, লক্ষ তারার এক চাঁদ, মাকে মারবার ইচ্ছা হয়েছে তোর ?'

মায়ের অশ্রুসিক্ত নয়ন দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলেন নিমাই। প্রগাঢ় মমতায় প্রশান্ত কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন—আমি কি আর আমার মধ্যে আছি ? আমার মন, প্রাণ, দেহ সব কিছু কৃষ্ণ কেড়ে নিয়ে গেছে। সেই ব্রজরমণ শ্যামসুন্দর যেন আমাকে দিনরাত ডাকছে। ঘরে পারছিনা থাকতে। কৃষ্ণের বাঁশী আমাকে দিয়েছে পাগল করে। আমি তাঁকে খুঁজব। খুঁজব সর্বস্ব ত্যাগ করে। 'যাব আমি কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও।—এতে আমার মঙ্গলই হবে মা।'

বৃন্দাবন ! সেই বন রাজিনীলা ! ব্রজসুন্দরের লীলাভূমি ! দু চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামল।

শচীর মুখে একটিও কথা নেই। স্থাণুর মত নিশ্চল তিনি। তাকিয়ে আ.ছেন পুত্রের অশ্রুসিক্ত বেদন-বিধুর মধুর মুখ পানে। তাঁর দু চোখে অঝোর বারিধারা।

নিমাই তখনও বলছেন—"এজন্মে আমি কাঁদতেই এসেছি। এসেছি সকলকে কাঁদাতে। আমার দুঃখে তোমরা কাঁদবে। তোমাদের দুঃখে জীব কাঁদবে। তাদের পাষাণ হৃদয় গলবে। তবেই তো আমি লাভ করতে পারব কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেম। তখন জীবও উদ্ধার পাবে আমার কাছে নাম নিয়ে। এত বড় ব্রত উদ্‌যাপনে তোমরা হবে না আমার সহায়? তোমরা শক্তি না দিলে আমি শক্তি কোথায় পাব? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব মা?'

ভাবের নদীতে ঢেউ জেগেছে। নিমাই নীরব হতে পারছেন না। কে যেন তাঁর হৃদয়ের দুয়ার ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু শচীদেবী নীরব। তন্ময়ের মত নিমাইয়ের কথা শুনতে শুনতে তিনিও যেন হারিয়ে গেলেন নিমাইয়ের মাঝে। ঠিক তখন শুনতে পেলেন আবার পুত্রের কণ্ঠ—মা, মাগো, তুমি কথা দাও। তুমি তো আমার মঙ্গল, আমার সুখই চেয়েছ। জীবন পাত করেছ আমার মুখের একবিন্দু হাসি দেখবার জন্যে। তবে যদি এ পথে আমার মঙ্গল হয়, যদি এতে আমার কল্যাণ হয়, জীবের কল্যাণ হয়—তবে কেন তুমি আদেশ দেবে না? কেন পাব না আমি তোমার অনুমতি? তুমি তো আমার সে মা নও! মা, মাগো, কথা কও। কথা দাও মা। তুমি মনের সুখে আমায় যেতে দাও।

এ যেন আকুলতার সুধা নির্ঝর। শচীদেবী মন্ময়। তাঁর অন্তরেও যেন নিমাইয়ের কাতর কান্না সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। এ কান্না যেন পাষাণকেও গলিয়ে দেয়। করে সমুদ্র। কিন্তু একি ধর্ম? জননী কাঁদবে, কাঁদবে প্রিয়া। ভক্তগণ ফেলবে চোখের জল। তাদের সবাইকে ত্যাগ করে ধর্ম আর কৃষ্ণ? কেন, কেন এ নিঠুরালী? শচী বিলাপ করতে লাগলেন—

সর্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
আগেতে মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥ চৈঃ মঃ

বিষ্ণুপ্রিয়ার নামটি কানে যেতেই শিউরে উঠলেন গৌরসুন্দর। শচী-দেবী তীব্রভাবে আঘাত করতে লাগলেন তাঁর পুত্রের প্রাণে—হ্যাঁরে নিমাই! লোকে বলে তোকে ভগবান। বলে সর্বজীবে তোর দয়া। কেবল এই চির দুঃখিনী অভাগিনী জননীর প্রতি তুই এত নির্দয় কেন ?'

শচীদেবী নানাভাবে নানা কথা বলে চাইছেন তাঁর নিমাইকে সহজে ফিরিয়ে আনতে। তাই আঘাত হানছেন বারে বারে। নিজের কথা ছেড়ে এবারে প্রভুর যারা প্রিয় গণ তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন নিমাইকে! স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্নেহান্ধ জননী রোদনভরা কণ্ঠে।

মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত আচার্য আদি আর হরিদাস॥
মরিবে সকল লোক না দেখিয়ে তোমা।
এসব দেখিয়া বাপ্ চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ চৈঃ মঃ

নীরব নিমাই। কি বলবেন? তাঁর সমস্ত কথা যেন গেছে ফুরিয়ে। হারিয়ে গেছে তার জীবনের বসন্ত। এবারে তিনি শুধু প্রার্থনা করছেন বিদায়। যাবেন কৃষ্ণ-কুঞ্জে বৃন্দাবনে।

কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছেন না শচী নিজেকে। কেমন করে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলবেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে? পাগলিনীর মত শচীদেবী পুত্রকে বলতে লাগলেন নীতিশাস্ত্রের কথা। বলতে লাগলেন, "আরও কিছু দিন সংসারে থাকো। এমন তরুণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করা ধর্ম নয়। তাছাড়া তোমার কাম আছে, ক্রোধ আছে, লোভ মোহ সবই আছে। তোমার দেহে যৌবন প্রবল। এভাবে কি তোমার সন্ন্যাস ব্রত সফল হবে?"

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥
মনের নিবৃত্তি কলি যুগে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম ক্ষয়॥
গৃহী জন মনঃ পাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম যায় মনোজয় শুদ্ধ॥ চৈঃ মঃ

এবারে গৌরাঙ্গ সুন্দর আর পারলেন না নীরব থাকতে। তাঁর সর্ব অন্তরে যেন এক মন্থন জাগল। করুণাময় প্রেমঘন নয়নে তাকালেন মায়ের পানে। সরে গেল শচীর মায়ার আবরণ। চলে এলেন তিনি জ্ঞান তীর্থে। তাঁর নয়নে আভাসিত হতে লাগল তাঁরই প্রিয় পুত্রের অপার্থিব রূপ।—

সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হইল।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘ যিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর-পীতাম্বর॥

* * *

দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥

* * *

জগৎদুর্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়।
কারু বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয়॥ চৈঃ মঃ

শচীদেবীর মন তখন গিয়েছে মায়া-মুক্ত হয়ে। জ্ঞানের আলোকে উদ্‌ভাসিত তাঁর অন্তর। মহাভাগ্যবতী শচী। তাঁরই গর্ভে স্বয়ং ভগবান হয়েছেন আবির্ভূত। তিনি চাইছেন জীবের কল্যাণের জন্যে গ্রহণ করতে সন্ন্যাস। কেন শচী তাঁকে তাঁর ক্ষুদ্র সার্থের আবর্তে রাখবেন অবরুদ্ধ করে? এ মহান কর্তব্যে শচী বরং আজ সহায় হবেন পুত্রের। তাই বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলেন শচীদেবী—"বাপ নিমাই, আমি জেনেছি তুমি কে। আজ আমি তোমাকে মনোসুখেই অনুমতি দিচ্ছি, তুমি জীব কল্যাণার্থে স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করো।"

এই অনুমানি শচী কহিলা বচন!
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপন সুখে করগে সন্ন্যাস॥ চৈঃ মঃ

একথা বলে আর স্থির থাকতে পারলেন না শচী। মুহূর্তে যেন সব কেমন হয়ে গেল। তিনি হারিয়ে ফেললেন জ্ঞান। শুষ্ক-জ্ঞান গুহা

থেকে শচী চলে এলেন বাৎসল্য প্রেমের অমিয় সায়রে। অনুশোচনার অনলে পুড়ে যেতে লাগল তাঁর অন্তর মন। হাহাকার করে উঠলেন শচী। লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে। কাঁদতে লাগলেন ডুকরে—

আমি কি বলিতে কি বলিলাম।
মা হ'য়ে নিমায়ে বিদায় দিলাম॥ চৈঃ মঃ

এ আমি কি করলেম। ওরে পাষাণ মাতৃহৃদয়, তুই কেমন করে অমন সোনার চাঁদকে চিরদিনের মত বিদায় করে দিলি?

আহা, আমার বাছার তো কোনো দোষ ছিল না। 'নিমাই তো আমার ওপরই করেছিল নির্ভর। আমি তাকে···আমি আমার নিমাইকে বিদায় করে দিলাম। নিমাই···আমার নিমুরে!

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন শচী। উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে রোদনভরা জীবনের সব দুঃখ, সব বেদনা। নিমাই মায়ের কান্নায় আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। মুছিয়ে দিতে লাগলেন চোখের জল। বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে, "কেঁদনা মা। তোমাকে তো সকল কথাই বলেছি। আমাকে যেদিন যখন অনুরাগ-ভরে ডাকবে, তখনই এসে আমি তোমার চরণপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখা দেব মা।"

যে দিন দেখিতে মোরে চাহ 'অনুরাগে'।
সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে॥ চৈঃ মঃ

ডাকতে হবে। তাঁকে অনুরাগ ভরে ডাকলেই তিনি এসে দেখা দেন। ভক্ত-প্রাণ যে ভগবানের বিশ্রামের বৈঠকখানা। তিনি কি ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন?

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ চৈঃ মঃ

নিমাইয়ের আশ্বাস-বাণী শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন শচী। নিমাইকে ডাকলেই সে এসে দেখা দেবে। দাঁড়াবে এসে তাঁর ভুবন-মোহন রূপ নয়ে জননীর সম্মুখে। একি কম আনন্দের কথা? জননীর কান্না যেন একটু থেমে এলো। নিমাই মায়ের কাছে মমতা মেশান কণ্ঠে বললেন, 'আমার এক ভিক্ষে আছে তোমার কাছে মা!'

অশ্রু-সিক্ত নয়ন দুটি প্রধাবিত হলো নিমাইয়ের পানে,—কি ভিক্ষা আবার বাবা ?

নিমাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমি তোমার কোনো কাজেই তো লাগলেম না। তোমার বধূ ঘরে রইল কাল হয়ে। সে জ্বলন্ত অগ্নি স্বরূপ। তাকে যত্ন করে কৃষ্ণনাম শিখিও। এই আমার শেষ ভিক্ষা মা।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম শুনে শচীদেবীর মনটা আবার হাহাকার করে ওঠে। এ যেন মরুর দহন। অসহ্য যন্ত্রণায় শচীদেবী করুণ সুরে লাগলেন আর্তনাদ করতে। প্রভুও আর পারলেন না ঠিক থাকতে। পুত্র ও জননীর কান্নায় মাটি ভিজে গেল।

লীলাময়ের এ লীলা শুধু কান্নার। ব্রজলীলা আর নদীয়া-লীলা। দুই-ই লীলা। কিন্তু এ দুই লীলার মধ্যে প্রভেদ অনেক। প্রভু একদিন সে কথা বলেছিলেন নিত্যানন্দকে! বলেছিলেন—'শ্রীপাদ ব্রজে ছিল ছুটাছুটি, ছিল বাঁশীর মিষ্টি সুর। ছিল ভ্রমণ। কিন্তু নদে তা নেই। এখানে শুধুই বিরহ, শুধুই হরিনাম, আর শুধুই কান্না।' অশ্রুধারায় তাঁর পথ ধুয়ে না দিলে তিনি আসবেন না। বিরহ অনলে পুড়ে দেহ কালো না হয়ে গেলে হরি কথা কইবেন না।

জননীর বেদনাহত মনের বিষ মুছে দিতে প্রয়াস পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। জননীর মুখের কাছে বলতে লাগলেন ধীরে ধীরে নিমাই, "ওঠো মা। আমি আরো কিছুদিন থাকছি সংসারাশ্রমে। যাবার আগে তোমাকে না বলে যাব না মা।"

শচী সে কথার কিছু জবাব দিতে পারলেন না। নিথর নিস্পন্দের মত পড়ে রইলেন ধূলার শয্যায়। কিন্তু লাভ করলেন মহা সম্পদ। সে সম্পদটি কি ? আজীবন 'হা গৌর! হা গৌর' বলে কান্নার মন্ত্র।

॥ বিশ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে গিয়েছেন পিত্রালয়ে। এদিককার সমস্ত সংবাদই পৌছল গিয়ে তাঁর কানে! শুনলেন কানাঘুষা—ঘুম নেই জননী শচীর নয়নে। নিমাই বলেছেন নিজ মুখে যাবেন সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ছেড়ে।

আর কি থাকতে পারেন বিষ্ণুপ্রিয়া? গেলেন অধীর হয়ে। আকুল চিত্তে যাত্রা করলেন পতি-গৃহের উদ্দেশ্যে।

শীতার্ত রাত। নিঃসীম অন্ধকার। পথ জনহীন। প্রিয়া পথ চলছেন. সঙ্গে তার বাবার বাড়ীর একটি লোক। কোনো দিকে খেয়াল নেই। শুধুই চলেছেন, আর চলেছেন। ভাবছেন কতক্ষণে এ পথ ফুরাবে! কতক্ষণে গিয়ে পৌছবেন তিনি স্বামীর পদপ্রান্তে। তাই তো এত আকুলতা। তাই তো এত উতলা প্রিয়া।

ঝির ঝির করে হাওয়া বইছিল। গঙ্গার বুকে মৃদু চুমু দিচ্ছিল সমীরণ। প্রিয়ার দেহেও এসে লাগছে তার পরশ। মাঝে মাঝে উঠছেন একটু কেঁপে কেঁপে। ছাই, পথ যেন আর শেষ হয় না!

হবে না। শেষ নেই এ পথের! এ যে অন্তহীন অসীম পথ। যতদূর যাবে, কেবল শুনতে পাবে তাঁর বাঁশীর ধ্বনি। বিসারিত পথের পানে তাকিয়ে যাবে এগিয়ে। আকুল করা ব্যাকুল মনে শুধু বলবে—

'শুধু বাঁশী শুনেছি
তাকে চোখে দেখিনি।'

ও যে ছলনাময়। ছল করে ঝরাণ তিনি চোখের জল। বেদনা দিয়ে রচনা করেন তাঁর বসবার আসন। ঝড়ের সংক্ষোভে ধুয়ে নেন আবিল ভরা চেতদর্পণ। তার পরে ঘটে তার আভাস; আভাতি।

ওরে তাঁর খেলার শেষ নেই। তাঁর লীলার অন্ত নেই। তিনি এক হাতে পান করান বিষ। আর হাতে তুলে দেন সুধাভাণ্ড। তিনি কান্নায়ও আছেন। হর্ষেও আছেন। তিনি সুখেও আছেন। আছেন

দুঃখেও। তাঁর আসন ভুবন জোড়া। তাঁর আসন প্রতিটি অন্তরে অন্তরে। চল, পথ চল পথিক। পথ ফুরাবে। প্রাণ জুড়াবে।

এদিকে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছেন নিমাই। আজ আর যাননি সংকীর্তনে। বিষ্ণুপ্রিয়া আহত হরিণীর মত পৌছলেন এসে। পৌছলেন পতি-গৃহে।

ধীর পদপাত। আথিবিথি অন্তর। উৎকণ্ঠায় অধীর, চঞ্চল। চুপি চুপি ঢুকলেন স্বামীর শয়ন কক্ষে। ঘুমিয়ে পড়েছেন গৌরসুন্দর। জ্বলছে শিয়রে একটি মাটির প্রদীপ। তারই শিখা এসে পড়েছে প্রভুর স্নিগ্ধ বদনে। আর সমস্ত দেহই আবৃত লেপে।

বিষ্ণুপ্রিয়া চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। দেখতে লাগলেন জলভরা নয়নে প্রিয় প্রভুর চন্দ্রানন। এক সময় সন্তর্পণে বসলেন। বসলেন খাটের উপর প্রভুর পদপ্রান্তে। শ্রীপদে হাত ছোঁয়াচ্ছেন না প্রিয়া। শীতল হাতের স্পর্শে যদি প্রভুর ঘুম ভেঙ্গে যায়? লেপের নিচে হাত দিয়ে বসে রইলেন প্রিয়া। যখন বুঝলেন এখন গরম হয়েছে হাত, তখন দুটি কোমল কমলে করতে লাগলেন প্রভুর পদসেবা।

রসবল্লভা তাঁর নীরব সেবা নিবেদন করছেন রসময়ের চরণতীর্থে। জীবের প্রতিভূ বিষ্ণুপ্রিয়া। এ তো জীবেরই সেবা নিবেদন। জীবেরই মিনতি কাতর আর্তি বিশ্ব-বন্ধুর সমীপে—চিরদিন এ দুটি চরণ-কমলে মতি রেখো! দিও সেবার অধিকার।

ভক্তের আর্তিই ভগবানের জাগরণের মন্ত্র। কি করে থাকবেন তিনি অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। প্রিয়ার প্রেমমধুর স্পর্শে প্রভুর ঘুম ভাঙ্গল। তাকালেন গৌরসুন্দর। তাকালেন দুটি আয়ত আঁখি মেলে প্রিয়ার পানে, 'প্রিয়া, তুমি!'

বিষ্ণুপ্রিয়া কোনো কথা বলতে পারছেন না। তাঁর দুনয়নে তখন ঝরছে ,অঝোর বারিধারা। অপলক তাকিয়ে আছেন শুধু। টপ টপ করে তপ্ত অশ্রু-বিন্দু পড়ছে শয্যার 'পর। প্রভুর প্রাণ গেল আকুল হয়ে। আর পারলেন না শুয়ে থাকতে। উঠে বসলেন। প্রিয়াকে টেনে আনলেন প্রশান্ত অঙ্কে। বসালেন উরুর 'পর। বললেন,—তুমি কাঁদছ প্রিয়া? ছিঃ চোখ মোছ। এতদিন পরে এসে কি কাঁদতে আছে?

আমি যে তোমার হাসিভরা মুখখানা দেখব বলে কতদিন ধরে আকুল হয়ে বসে আছি। 'কি হয়েছে তোমার? কেন কাঁদছ?'

দু নয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার পূছে অভিপারা॥
'মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি' কান্দ কি কারণে জানি,
কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে চিবুক দক্ষিণ করে,
পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥ চৈঃ মঃ

প্রভুর প্রিয় সম্ভাষনে প্রিয়ার বেদনবিধুর আহত অন্তর আরও যেন উদ্‌বেল হয়ে উঠল। নয়নে বয়ে যায় অশ্রুর বন্যা। যে জন্যে প্রিয়া পিত্রালয় থেকে এসেছেন ছুটে, হয়নি তার এখনও নিরসন। একটা বিপদাশঙ্কায় শুধুই কাঁদছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দু'হাতে প্রভুর দুটি চরণ ধরে নীরব অশ্রুতে লাগলেন তা ধুয়ে দিতে।

প্রভুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া অধীর। কিন্তু রুদ্ধ কণ্ঠ। কে যেন তাঁর বাক্য স্ফুরণে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

প্রভু আর যেন দেখতে পারছেন না প্রিয়ার আঁখিধার। তিনি টেনে নিলেন তাঁকে কোলে। দিতে লাগলেন দুটি সিক্ত চোখ মুছিয়ে।

অনেক কষ্টে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর পানে তাকালেন। থর থর করে কাঁপছিল তখন তাঁর সমস্ত অঙ্গ। যেন বিবশ হয়ে আসছে কোমল কমল তনু। আড়ষ্ট বিহ্বল কণ্ঠে এক সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে শুধালেন 'ওগো, আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলো, তুমি নাকি তোমার দাদার মত আমাদের ছেড়ে সন্ন্যাস নেবে?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ঝাকুনি দিয়ে উঠল প্রভুর দেহে। যে কথা রেখেছেন তিনি গোপন, তা প্রিয়ার কানে কে দিলে! ছলনাময় নানা ছলে ভোলাতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বললেন সহজ ভাবে, 'কে বললে তোমায় একথা? ও কিছুনা। মিছে কথা।'

আরো কাছে একেবারে বুকের মধ্যে প্রভু টেনে নিলেন প্রিয়াকে। ধরলেন দুটি বাহুদিয়ে জড়িয়ে। কিন্তু প্রিয়ার মন ভোলে না। কেন যেন তাঁর অন্তরাত্মায় একটা প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছে! তাই আবারও বললেন তিনি। বললেন কাতর নয়নে তাকিয়ে, 'আমার মাথার দিব্যি, সত্যি করে বলো!'

হেয়ালীর মত জবাব দিলেন গৌর সুন্দর, 'সত্যিই তো বলছি।'

চৌদ্দ বছরের রূপসী তন্বী প্রিয়া। ময়নলোভন কান্তি। যৌবনের ঢল নেমেছে দেহের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে। প্রশস্ত ললাট। উন্নত নাশা। আনিতম্ব কেশ। সুডৌল জঙ্ঘা। পীনোন্নত স্তন। যেন শত চন্দ্রের বিভায় স্নিগ্ধ। দুটি মৃণাল বাহু দিলেন প্রসারিত করে প্রিয়া। তাকালেন আয়ত কাতর আঁখিতে। আবদ্ধ করলেন যৌবন-সম্রাট রসবল্লভ গৌর সুন্দরকে। আবদ্ধ করলেন আবক্ষ আলিঙ্গনে। অধরে রাখলেন অধর। উজার করে ঢেলে দিলেন সুধা-সমুদ্র। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেন গৌর, প্রিয়া। এ যেন কেলিকুঞ্জ। শ্রীরাধার সঙ্গে মিলন বাসরে রজনী যাপন করছেন কৃষ্ণকান্ত। দেহ মন দিয়ে রসবল্লভের সুখ সম্পাদন করছেন রসবল্লভা। নদীয়া-বিনোদ বিলাস-বাসরে যুগলরূপ ধারণ করলেন বিনোদিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। প্রিয়ার কণ্ঠে তখন শুধু একটি প্রার্থনাই প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—এমন করে আজীবন জড়িয়ে থাকতে দিও!

কখন যে ঘুম এসে চুমু দিল চোখের পাতায় খেয়াল নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। সহসা জেগে উঠলেন তিনি। রাত তখন কম হয়নি। এক এক করে অতিক্রান্ত হয়েছে তিনটি যাম। প্রিয়া ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন। বিস্ময়ের অন্ত নেই তাঁর। সমস্তটা অন্তর যেন হাহাকার করে উঠল—'কি হোল! কি হোল! কাঁদছ কেন?'

'না তো! কাঁদছি কই? দিব্যি হাসছি তো।'—তাড়তাড়ি গৌরসুন্দর সামলে নিলেন নিজেকে। চাইলেন আত্মগোপন করতে। প্রসন্ন হয়ে উঠলেন কৃত্রিম হাসির ছোঁয়ায়। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হলো। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'আর আমাকে ফাঁকি দিওনা! বলো, সত্যি করে বলো, কেন এত কান্না?'

আনত মস্তকে ধরা গলায় বললেন প্রভু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'প্রিয়া, যা শুনেছ সব সত্যি। আমি বৃন্দাবনে যাবো কৃষ্ণের সন্ধানে!'

আর্তকণ্ঠে প্রিয়া একটা চিৎকার দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিফল হলো তাঁর সে প্রয়াস। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। অধর সম্পুটে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রবল কম্পন। অস্পষ্ট কণ্ঠে শুধু বললেন, 'তুমি সন্ন্যা—স—নে—বে?'

আর একটিও কথা নেই। সব থেমে গেল। চেতনহারা দেহটি এলিয়ে পড়ল গৌরসুন্দরের অঙ্কে।

'প্রিয়া! প্রিয়া!'

না আর কোনো সাড়া নেই। শুব্ধ রজনীর মত নিথর হয়ে গিয়েছে প্রিয়ার দেহ। প্রভু দিকভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'হায় হায়, আমি এ কি করলেম!'

মূর্চ্ছিতা প্রিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে সমস্ত আবেগ ঢেলে ডাকলেন, 'ওঠো প্রিয়া! তাকাও চোখ মেলে। আমাকে এত বড় আঘাত তুমি করো না। আমার কথা শোন।'

এমনি করেই একদিন বেজেছিল ব্রজেন্দ্র নন্দনের বাঁশরী 'রাধা রাধা' বলে। এমনি করেই বুঝি কৃষ্ণ ডেকে ছিল 'রাই, রাই' বলে।

আকুল করা কণ্ঠ। শক্তিসঞ্চারিত আহ্বান। এ ডাকে মৃতেরও দেহে সঞ্চার হয় জীবনের। প্রিয়া চোখ মেলে তাকালেন। বসলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মুখোমুখী। আজ আর দ্বিধা নয়। লাজ নয়। শচী একদিন বলেছিলেন প্রিয়াকে—'ওরে তোর নিজের জিনিস বুঝে নে।' আজ বুঝে নেবার লগন এসেছে প্রিয়ার জীবনে। প্রভু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে, 'আর কিছু তোমাকে লুকাবনা প্রিয়া। আমি যাবো আমার কৃষ্ণ সন্ধানে। এতে আমার ও তোমার দুইয়েরই মঙ্গল।'

বেদনাকরুণ কণ্ঠে প্রিয়া বললেন, 'আমার আবার মঙ্গল? তোমার কৃষ্ণ আছে। কিন্তু আমার থাকবে কি?'

'কেন তোমারও কৃষ্ণ আছেন।'

ক্রমেই প্রিয়া যেন ভেঙ্গে পড়ছেন—না না আমি কৃষ্ণ জানি না। কৃষ্ণকে চিনি না। কতদিন তোমার প্রিয় কৃষ্ণকে দেখতে চেয়ে আমি

যে দেখেছি তোমাকে। তোমার মাঝেই মিলিয়ে আছে আমার কৃষ্ণ। আমার বিষ্ণু।

কিছুতেই পারছেন না প্রভু প্রিয়াকে শান্ত করতে। পারছেন না তাঁর সহজ মনের অনুমতিটি আদায় করতে। অনুমতি না নিয়ে তো প্রভু যাবেন না! তাই তো এত ছলাকলা। এত ক্রন্দন, কীর্তন। বললেন এক সময়ে প্রভু, 'তোমার নাম না বিষ্ণুপ্রিয়া? সার্থক করে তোল তোমার নাম।' অন্য চিন্তা মন থেকে বিদায় দাও প্রিয়া। অকারণ শোক করছ কেন? কৃষ্ণ ভজনা কর।'

শ্রীমতীর ভাবের নদীতে যেন বাণ ডেকেছে। অবিশ্রান্ত প্রশ্নবাণে প্রভুকে জর্জরিত করতে লাগলেন, প্রিয়া। এসব তত্ত্ব কথা তাঁকে আজ আর বশে আনতে পারছেনা। অজস্র কথার কান্না বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণকে বিদ্ধ করতে লাগল কাটার মত। তিনিও তা বলে যেতে লাগলেন বিনা দ্বিধায়—যদি পথে হেঁটে হেঁটে তোমার পায়ে রক্ত ঝরে? যদি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আহার না গ্রহণ করো? যদি শ্রান্ত হয়ে ঐ নবনী কোমল দেহ যায় ঘর্মসিক্ত হয়ে? তবে কে, কে মুছিয়ে দেবে তোমার পায়ের রক্ত, দেহের ঘর্ম? কে তুলে ধরবে মুখের কাছে অন্নব্যঞ্জন? কে করবে তোমার পদ সংবাহন?'

দুটি অশ্রু সজল কাজল চোখ তুলে ধরলেন প্রিয়া প্রভুর পানে। বড় বেদনায় বিষ্ণুপ্রিয়া আজ এসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ তিনি জানেন তাঁর প্রভুর স্বভাব। তাছাড়া তিনি দেখেছেনও তাঁর অবস্থা। কৃষ্ণনামে মত্ত প্রভু। আর যেন কোন আকর্ষণই তাকে ধরে রাখতে পারছে না। তাই তো অভিমান ভরে প্রিয়া প্রভুকে আটকে রাখবার জন্যে আঘাত করছেন। প্রেমের আঘাত। প্রীতির আঘাত।

প্রভু এতটুকু রুষ্ট হচ্ছেন না। তিনি তাঁর প্রিয়ার কথা শুনে দুটি বাহুতে আকড়ে ধরলেন তাকে বক্ষে। প্রিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন, 'লোকে তোমাকে দেবে অপবাদ। বলবে, মা-বউকে ছেড়ে তুমি গিয়েছ। তা আমি কি করে সইব, বলো?'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'না হয় আমি বাবার বাড়িতে

চলে যাই। তবুও তুমি ঘরে থাকো। যেও না। তুমি কি বোঝ না, 'তুমি সন্ন্যাস নিলে মা কি করে বাঁচবেন!'

'মা যে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন প্রিয়া।'

'মা অনুমতি দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, জীবের কল্যাণে তিনি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন।'

একটা বজ্রসম্পাত হলো যেন। স্থানুর মত বসে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। সব কথা এই মুহূর্তটায় ফুরিয়ে গেল তাঁর। আরক্ত আঁখি বেয়ে টপ টপ করে পড়তে লাগল অশ্রুবিন্দু।

প্রভু এবারে অবলম্বন করলেন অন্য পথ ও পন্থা। কিছুতেই যখন প্রিয়াকে তিনি বোঝাতে পারলেন না, তখন তিনি প্রকাশিত হলেন ঐশ্বর্য মূর্তিতে।

আপনি ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে॥ চৈঃ মঃ

গৌরসুন্দর রূপান্তরিত হলেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণু-মূর্তিতে। প্রিয়া সে রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। আনন্দে নৃত্য করে উঠল তাঁর অন্তর। ভক্তি বিনম্র নেত্রে জানালেন প্রণাম। আহা কি লীলা! নানা ছলে চলছে প্রভুর ছলনা। চাইছেন প্রিয়াকে পরাভুত করতে। কিন্তু মুহূর্তের এ তন্ময়তা। পরক্ষণেই প্রিয়া আকুল হয়ে গেলেন তাঁর প্রিয় প্রভুর জন্যে —'না না না, আমি ঐশ্বর্য চাই না। ও রূপ আমার ভালো লাগে না। স্বামীই আমার পরম দেবতা। কোথায় তিনি? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে এনে দাও!'

আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রিয়া, লুটিয়ে পড়লেন শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাস-মূর্তি শ্রীবিষ্ণুর চরণতলে। ঐশ্বর্য দিয়ে জয় করতে পারলেন না প্রভু তাঁর প্রেমময়ী বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কেমন করে পারবেন? বিষ্ণুপ্রিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁরই প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ। তিনি তো ঐশ্বর্যের ভিখারিণী নন!

সহজ হয়ে এলেন প্রভু। ধরা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বললেন প্রসন্ন চিত্তে, 'প্রিয়তমে, ধন্য তুমি। ধন্য তোমার পতিপ্রেম ও ভক্তি। তুমি আমার জন্যে চতুর্ভুজ মূর্তিধারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুকেও করলে উপেক্ষা? প্রিয়া, আমার হৃদয়ে তোমার চির বসতি, যেনো। লোকে জানবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেছি। কিন্তু তুমি থাকবে চিরদিন আমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে। তুমি যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তখনই তোমার সে ডাকে সাড়া দেব। দেখা দেব।'

বিহ্বলের মত বিষ্ণুপ্রিয়া তখনও তাকিয়ে। প্রভুর কথা শুনতে শুনতে গিয়েছেন তন্ময় হয়ে। প্রভু ডাকলেন, 'প্রিয়া!'

তাঁকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর পানে। শ্রীগৌর গম্ভীর কণ্ঠে বড় বেদনায় বলতে লাগলেন, 'প্রিয়া, এ জীবনে শুধু দুঃখই হলো আমার একমাত্র সঙ্গী। কত কাঁদলেম। কেঁদে কেঁদে নিজেকে উজার করে দিলেম। তবুও জীব নিলে না কৃষ্ণনাম।'

প্রভুর কণ্ঠও যেন এবারে গদগদ হয়ে এলো। দুঃখে, বেদনায়, বিরহ-বিধুর গৌর সুন্দর আবার বলতে লাগলেন, 'প্রিয়া, তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না। তোমাকে কাঁদাবার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করব। তুমি কেঁদে জীবকে কাঁদাবে। তোমার কান্নায় জীবের সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। একা আমার কান্নায় হলো না। তাই তো তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছি। তোমরা আমাকে এটুকুও দিবে না?'

নিস্তব্ধ রাত্রির চোখেও যেন তখন জল ঝরছে। বাতাস গিয়েছে নিথর হয়ে। একটি নির্মম মর্মান্তিক মুহূর্ত এ যে। প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করে উঠল। সহসা একটা দমকা বাতাস চলে গেল।

শিথিল কবরী। এলোমেলো কেশ। স্খলিত বসন। কম্পিত হিয়া। কি বলবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। কীইবা আছে তাঁর বলবার? আপন অন্তর সম্পদকে হাতে ধরে বিদায় করে দিতে কে চায়? কেইবা তা পারে?

পারে। কে?

বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভুর চোখের কোণেও তখন বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়েছে। প্রিয়াকে তা গোপন করলেন সাবধানে। বলতে লাগলেন, 'যে কাজ নিয়ে এসেছি,

তা যদি না করতে পারি, তবে যে আমার অমঙ্গল হবে। জীবের অমঙ্গল হবে। জীবের দুঃখে আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। তুমি না আমার সহধর্মিণী? আমার এ ধর্ম কার্যে তুমি আমাকে সহায়তা কর প্রিয়া।'

প্রিয়ার অন্তর-বীণায় ঝঙ্কার জেগেছে। একটা তার বুঝি ছিঁড়ে গেল। প্রিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রভুর পানে তাকালেন। বললেন করুণঘন কণ্ঠে, 'তুমি বলছ, সন্ন্যাস নিলে তোমার মঙ্গল হবে? জীবের সব পাপ ধুঁয়ে যাবে? জীবের মঙ্গল হবে?'

'হ্যাঁ প্রিয়া, সত্যি জীব মুক্তি পাবে। তাদের মঙ্গল হবে।'

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রিয়া বললেন, 'হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি ইচ্ছাময়।...তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

কণ্ঠ প্রিয়ার যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। বড় কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। তবুও জীবনের শেষ ভিক্ষাটি আজ তিনি চেয়ে নেবেন তাঁর প্রাণবল্লভের কাছ থেকে। বলতে থাকেন প্রিয়া, বলতে থাকেন প্রভুর চরণ দুটি ধরে—'এ-জনমে কাঁদতে এসেছিলাম। কেঁদেই কাটাব। দুঃখিনী দাসীকে এ দুটি চরণ সেবার অধিকার জনমে জনমে দিও। এই আমার শেষ নিবেদন প্রভু!'

প্রভু দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলেন প্রিয়াকে। বললেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়ে, কলিহত জীবের পরিত্রাণের জন্য তুমি আজ যে উপকার করলে, চিরদিন তা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ভক্তদের হৃদয়ে।...শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।'

জীবের দুঃখে প্রিয়া তাঁর সর্বপ্রিয় বস্তু আজ অকাতরে ইন্ধন দিলেন। প্রভু মুছিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা। কোলের মধ্যে বসিয়ে চিবুক ধরে তাকালেন প্রিয়ার পানে। তখনো থামেনি প্রিয়ার কান্না। দুটি গণ্ড বেয়ে নীরবে ঝরছে স্বচ্ছ জলের ক্ষীণ স্রোত। গৌরসুন্দর ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে বললেন, 'কেঁদো না প্রিয়া। তোমার চোখে জল দেখলে আমি বড় ব্যথা পাই। কথা শোন, মায়ের কাছে বলেছি, আরো কিছুদিন সংসারে থেকে তোমাদের সুখী করব। তোমাদের না বলে আমি যাবো না!'

দুঃখের দহনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে প্রিয়ার দেহ। মনের নিভৃতে জ্বলছে আগুন। কিন্তু তার মাঝেও প্রিয়া কত খুশী। প্রভু আশ্বাস দিয়েছেন। না বলে তিনি যাবেন না। সবাইকে বলে কয়ে তিনি বিদায় নেবেন। নেমে আসবেন জীববন্ধু জীবকল্যাণে জীবেরই জনতায়।

প্রিয়ার চোখে তন্দ্রা এলো। এ বেদনাময় পরিচ্ছেদ এখানেই হলো শেষ। প্রিয়ার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন শিথিল হয়ে এলো। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুমিয়ে পড়লেন গৌরসুন্দরের বক্ষ-সজ্জায় যুগল হয়ে।

॥ একুশ ॥

ঈশান আর গোবিন্দ গৌর-মন্দিরের সেবায়েত্। ওরা করে ভগবানের সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম। তাদের ওপরে তত্ত্বাবধায়ক হলেন আবার দামোদর পণ্ডিত। দেখা শোনার কাজটি তাঁর।—নিখুঁত ভাবে কাজ করো গৌর-মন্দিরের। দেখো, যেন থাকে না কোনো অপরিপাট্যতা। সুখের সংসার শচীর। নিত্য কত ভক্তের আনাগোনা। কত না দর্শনার্থীর জমায়েৎ। কীর্তন আর ভোগ তো লেগেই আছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে বসেছেন শচীদেবী। তার কি আর আনন্দের সীমা আছে? বিষ্ণুপ্রিয়াও ডুবে গেছেন আনন্দের মধুরে। প্রভু আজকাল ঘরেই থাকেন। থাকেন তাঁর কাছে।

এমনি করে কেটে গেল গোটা দেড়েক মাস।

আজ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। মাঘ মাস। দিনটি ভালো। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করলেন নিমাই। সেরে ফেললেন প্রাতঃকৃত্য। মাকে ডেকে বললেন, 'আজ বড় ভালো দিন মা। বৈষ্ণবদের বেশ করে ভোজন করিয়ে দাও।'

শচীদেবীর তাতে কি আর অমত আছে? সকাল থেকেই শাশুড়ী আর বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া মিলে হাতে হাতে কাজ করতে লাগলেন। নিমাইও আজ পরম আনন্দে যেন ভাসছিলেন। তার পরে আবার ভক্তরাও আসছেন দলে দলে। ভালো দিন বলেই প্রভুর চরণ-ধূলি নেবার অদম্য

প্রয়াস। সবার হাতেই ফুলের মালা। ফুল বড় প্রভুর প্রিয়। তাছাড়া আরো কত কি নিয়ে আসতে লাগলেন তাঁরা। আসতে লাগলেন প্রভুকে প্রণাম করতে। এক একটি ভক্ত এসে প্রণাম করেন প্রভুকে। প্রভু জনে জনে ডেকে বলেন, 'তোমরা কৃষ্ণের ভজনা করো। তাতেই আমার সন্তোষ হবে।'

ভক্তি বিনম্র নেত্রে তাঁরা প্রভুর পানে তাকিয়ে চলে যাচ্ছেন কীর্তনাঙ্গনে।

আজ সকাল থেকেই কীর্তন হচ্ছিল। শেষ হলো দুপুরের খাওয়া। গৌর-সুন্দর তাঁর প্রাণ-প্রিয় ভক্তদের নিয়ে এক আসরে বসে ভোজন করলেন।

অপরাহ্ন। প্রেমের গৌর বের হবেন নগর ভ্রমণে। তাই অন্তরঙ্গ গদাধর বেশ বিন্যাস করছেন নিমাইয়ের। গলায় পরিয়ে দিলেন মালা। ললাটে এঁকে দিলেন চন্দনের বিন্দু। মনের মানুষটিকে মনের মতন করে সাজাচ্ছেন গদাধর। যেন আর শেষ হয়না। প্রভু বলেন,—গদাধর বেলা যায়।

সত্যি বেলা বয়ে যাচ্ছে। আর সময় নেই। সাধের নদীয়াকে প্রাণ ভরে শেষ দেখা দেখে নেবেন নিমাই। তাই তাড়া দিচ্ছেন—তাড়াতাড়ি করো গদাধর!

ভক্ত-পরিবৃত গৌরসুন্দর ঘুরে বেড়ান নবদ্বীপের পথে পথে। সাক্ষাৎ করলেন কত অনুরাগীদের সঙ্গে। দাঁড়ালেন গিয়ে কত দ্বারে দ্বারে। সন্ধ্যায় চলে এলেন তাঁর সেই আবাল্য স্মৃতিবিজড়িত প্রিয় স্থান সুরধুনী-পুলিনে। আকাশে বাতাসে বেজে উঠেছে তখন গৌর বিসর্জনের মর্মচ্ছেদী সুর। গঙ্গার বুকে বিরহের প্রশান্ত কল্লোল। গৌরাঙ্গসুন্দর একবার মনে মনে প্রণাম জানালেন তার উদ্দেশে। ফেললেন দু'ফোঁটা চোখের জল। কিন্তু কেউ তা দেখল না। কেউ তা বুঝল না।

প্রায় এক প্রহর সুরধুনা-তীরে কাটিয়ে ফিরলেন ঘরের পথে। আজ গৌর দর্শনের মহাযোগ। নরনারী দলে দলে আসছে তাঁদের প্রাণের গৌরকে দেখতে। সাধন-পরায়ণ মনে গৌর নাড়া দিয়েছেন। টেনে আনছেন শেষ দর্শনার্থে কাছে। শেষ কথাটি বলে যাবেন শ্রীগৌরাঙ্গ। বলে যাবেন তাঁর প্রিয় নদীয়াবাসীর কাছে।

নদীয়ার প্রাণ গৌর সবাইকে সম্বোধন করে বলছেন, 'বন্ধুগণ, আমাকে যদি এতটুকুও ভালো বেসে থাকো, তাহলে আমার একমাত্র প্রার্থনা তোমাদের কাছে, তোমরা কৃষ্ণ ভজনা করতে ভুলো না।'

শেষ কথাটি বলতে বলতে বুঝিবা সোনার গৌরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। চোখে দেখা দিল অশ্রু। কিন্তু গৌর গোপনচারী। কে তা দেখবে? কেউ দেখল না সে বিদায় বেলার বিসন্নতা।

ঠিক এমনি সময় হাতে একটি কচি লাউ নিয়ে সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল একটি লোক। বড় কাঙ্গাল। বেশে বাহার নেই। দীনতায় নম্র। চোখ দুটি অশ্রু সজল।

দীনের দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের চোখ পড়ল সেদিকে। আকুল-করা কণ্ঠে বললেন প্রভু, 'কে? শ্রীধর? কাছে আয়। বাঃ চমৎকার লাউ এনেছ তো। কোথায় পেলে?'

দরিদ্র শ্রীধর। তার দেবার মতন আর কী-ইবা আছে? তাই নিজের গাছ থেকে লাউ নিয়ে এসেছে।

আজ না খেলে শ্রীধরের এ লাউ আর খাওয়া হবে না। তাই মাকে ডাকলেন নিমাই। বললেন, 'এ লাউ দিয়ে পায়েস রান্না কর মা। ভক্তগণও প্রসাদ পাবেন ঠাকুরের।'

শ্রীধরের পানে তাকিয়ে বললেন প্রভু, 'তুমিও বসো শ্রীধর। প্রসাদ পেয়ে বাড়ি যাবে।'

শ্রীধরের এ কচি লাউ-এর পায়েসই হলো শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ ভোজনের উপাচার। আর তিনি বসবেন না গার্হস্থ্য জীবনের ভোজের আসনে।

রাত্রি হলো দ্বিপ্রহর। ভক্তগণ এতক্ষণে বিদায় নিয়েছেন। অন্য দিনের মত আজও শয়নকক্ষে যাবার আগে নিমাই প্রণাম করলেন মাকে। একবার হাতখানা কেঁপে উঠল। মায়ের পানে যেন তাকাতে পারলেন না। মনে মনে বললেন,—তোর অধম সন্তানকে ক্ষমা করিস মাগো! তোর পায়ের ধূলোই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।

প্রভু এলেন শয়নকক্ষে। একটু পরেই বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন। হাতে তাঁর সুগন্ধি তাম্বুল। চন্দন, কুঙ্কুম ও আরও কত কি। তাম্বুলটি প্রভুর মুখে

পুরে দিলেন প্রিয়া। বললেন সোহাগের হাসি হেসে, 'যদি অনুমতি দাও, তবে আজ আমি তোমাকে মনের মতন করে সাজাব।'

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু বাঁকা হাসি দিয়ে বললেন, 'তোমার জিনিস তুমি সাজাবে। আমি কেন বাধা দেব?'

—কিন্তু একটি শর্ত আছে।

কি সে শর্তটি?

'আমিও তোমাকে সাজাব। অমত করতে পারবে না কিন্তু।'

প্রিয়া মিষ্টি হেসে বললেন, 'পুরুষ মানুষ আবার সাজাতে জানে নাকি?'

প্রভু বললেন, 'দেখো।'

প্রিয়া বললেন, 'আচ্ছা দেখা যাবে।'

মনের মাধুরী দিয়া
গৌর-অঙ্গ সাজায় প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর প্রভুকে সাজাতে বসলেন। গলায় পরিয়ে দিলেন মালতীর মালা। অঙ্গ অনুলিপ্ত করলেন চন্দনে। ললাটে পরালেন সুগন্ধি তিলক। প্রেম মধুরে প্রিয়া আত্মহারা। কত আনন্দ। কত সুধা পান। এ ক্ষুধা যেন মেটে না। প্রাণে প্রাণে চলেছে এক নীরব মধুর আলাপন। দেহে দেহে জানাজানি। চোখের পলক যেন আর পড়ে না।

রাত গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছে নবদ্বীপের জনতা। ঘুমিয়ে পড়েছেন শচীদেবী। কেবল আকাশে জেগে আছে চাঁদ। আর আছে জেগে অসংখ্য তারার বেদন-স্তিমিত আঁখি।

প্রিয়াকে কোলে টেনে নিলেন প্রভু। এবারে তাঁর পালা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার লাজ-নত মুখখানা করপল্লবে ধরলেন। এ যেন ফুটন্ত একটি পদ্ম। সোহাগ ভরে একটি চুম্বন করলেন। বসলেন সাজাতে। দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ প্রিয়ার। তা দিয়ে প্রভু বাঁধলেন কবরী। কণ্ঠে পরালেন মালতীর মালা। ললাটে অঙ্কন করলেন সিঁন্দুরের বিন্দু। তার চারি ধারে এঁকে দিলেন চন্দনের ফোঁট। শুধু কি তাই? খঞ্জন নয়নে আঁকলেন অঞ্জনের রেখা। কুচ যুগলে মাখিয়ে দিলেন 'অগোর কস্তুরী গন্ধ'। আহা

কি রূপ ! দিব্য বস্ত্রে রচনা করলেন কাঁচুলী। সমস্ত অঙ্গ ঢেকে দিলেন অলঙ্কারে।

খঞ্জন নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভূরু কাম-কামানের গুণ করিলেক॥
অগোর কস্তুরীগন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিলা কাঁচুলী পর তেখে॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভরিলা তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহার অপার॥ চৈ মঃ

তার পর ?

বললেন প্রভু, 'কেমন সাজিয়েছি দেখো। আমার মনের মতন সাজ।'

বিষ্ণুপ্রিয়া হেসে বললেন, 'তোমার এ গুণটি আছে জানলে তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম। এখন থেকে তুমিই বেঁধে দিও আমার কবরী। আর কষ্ট দেব না কাঞ্চনাকে।'

প্রভু বললেন, 'কাঞ্চনাকে এ কথা বলতে লজ্‌জা করবে না তোমার ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া জবাব দিলেন হেসে হেসে, 'সখীর কাছে আবার লজ্‌জা ? তোমার সব কথা আমি কাঞ্চনাকে বলি, জানো ?

প্রভু যেন একটু লজ্জাড়ষ্ট হলেন। কিন্তু প্রিয়ার রূপ তাঁকে করল আকৃষ্ট। চৌদ্দ বছরের যৌবন। এ বড় দুঃসহ। বড় চঞ্চল। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিকশিত দেহ-কমলের সুবাসে মত্ত গৌর ভ্রমর।

ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপ নিরীখে বদন।
অধর মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে॥

শেষ খেলায় গৌরপ্রিয়া মত্ত। প্রাণ উজার করে গৌরসুন্দর আকণ্ঠ সুধা পান করছেন প্রিয়ার অধর সম্পূট থেকে। ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে ধরছেন বক্ষে। নানা রসে রসিয়ে তুলছেন তাঁকে। এ যেন প্রতিটি অঙ্গের জন্য প্রতিটি অঙ্গের ক্রন্দন। মিলন বিলাপে বিলোল। প্রিয়ার রূপসায়রেও যেন আজ ডেকেছে বাণ।

সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখে রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোহে এ সজ্জা॥ চৈঃ মঃ

প্রিয়াকে টেনে নিলেন গৌর। টেনে নিলেন তাঁর আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে।

প্রিয়াজীর অঙ্গ আনন্দে পুলকে বিবশ হয়ে এলো। তিনি প্রভুকে বললেন, 'নাথ আমি কোথায় আছি গো? একি সুখ না দুঃখ? বিষ না অমৃত? আমি চেতন কি অচেতন কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি আমায় দৃঢ় করে ধরো।'

প্রভু দিলেন প্রিয়ার বুকে বুক। দিলেন মুখে মুখ। নয়নে নয়ন মিলে গেল। দুটি দেহ যেন এক বৃন্তে ফোটা একটি কুসুম। তা তো হবেই। প্রিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাস মূর্তি। কেবল লীলা রস আস্বাদনের জন্য দুটি রূপ। আজ বিদায়ের প্রাক্কালে বুঝি গৌরগুণমণি তাই দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রিয়াকে। দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁর বিলাস মূর্তির উৎসটি।

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোহে সুখে নিদ্রা যায়॥ চৈঃ মঃ

প্রভুর প্রশান্ত বক্ষে ঘুমিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া। হলেন গভীর নিদ্রায় অচেতন।

॥ বাইশ ॥

চল মন এগিয়ে চল।

এগিয়ে চল সীমা থেকে অসীমে। রব থেকে রম্যে। কান্না থেকে কীর্তনে। আর তো সময় নেই বসে থাকবার। ডাক এসেছে রে, ডাক এসেছে। শুনতে পাস্ না, ঐ পাগল করা বাঁশরীর সুর বিতান? শুনতে পাস্ না তাঁর পায়ের ধ্বনি? আমি যে আর পারি নে। চল, নিয়ে চল

আমাকে ছায়া থেকে কায়ায়। দয়া থেকে দর্শনে। আমি দেখব আমার কৃষ্ণকে। যাবো বৃন্দাবনে।

রাত্রির তৃতীয় যাম। নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। পাশের ঘরে জননী শচী দেবীও ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। নিমাই উঠে বসেছেন শয্যায়। প্রিয়ার দুগ্ধফেননিভ শয্যার আরাম বিলাস গিয়েছে শেষ হয়ে। আর ঘরে নয়—এবারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁর দিঠি। বিশ্ব অঙ্গনের নিঃসীম বিস্তারে তাঁর ঠাঁই। যাত্রার মহালগন হলো সমাগত। কে যেন ভাসিয়ে দিল, ভাসিয়ে দিল একটি সুর পাগল-করা সদয় সমীরে।

ধীরে ধীরে উঠে বসলেন নিমাই। তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুমন্ত মুখখানার পানে। পাশ বালিশটা রাখেন তাঁর বুকের 'পর। কেন? ও আতপ্ত বক্ষে এতক্ষণ নিষুপ্ত ছিলেন নিমাই সুন্দর। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি পা ছিল নিমাইয়ের পায়ের ওপর। সেখানেও গুজে দিলেন একটি উপাধান। তাকালেন প্রিয়ার মুখ পানে। শেষ বারের মত দেখে নিলেন গোরা, দেখে নিলেন সৌন্দর্যের মধুমন্থ বৈভবে সমুজ্বল প্রিয়ার চন্দ্রানন। চুম্বন করলেন একটি। চুম্বন করলেন ধীরে সন্তর্পণে প্রিয়ার আরক্তিম অধরে।

শয্যা থেকে নামলেন নীচে। খুলে ফেললেন দরজার খিল। পা বাড়ালেন ঘরের বাইরে। ফিরে তাকালেন প্রিয়ার পানে। বললেন অস্ফুটে,—'যাই প্রিয়া! একান্ত অসহায় মনে করে তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো!'

দাম্পত্য-জীবনের শেষ প্রণয় সম্ভাষণ জানালেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এলেন বাইরে। দাঁড়ালেন থমকে। নিবে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের অনির্বাণ দীপ শিখাটি। নিবে গেল আজন্মের মত। এ আলো আর জ্বলবে না! এ বাতি আর আসবে না কেউ জ্বালতে!

'নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণে।
পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে॥
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়া।
বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া॥'

ছিন্ন কন্থা নিমাই করলেন পরিধান। রাখলেন খুলে বসন ভূষণ। হলেন বিষয়ে বিরাগী। অনাবৃত দেহ। স্খলিত চরণ। স্পন্দন দ্রুত বক্ষ।

মনে মনে স্মরণ করলেন স্বর্গত পিতাকে। জানালেন প্রণাম। জননীর দ্বার প্রান্তে মাথা নত করে ফেললেন দু ফোটা চোখের জল। দাদা বিশ্বরূপের উদ্দেশে আনত হলো শির। মনের নেপথ্যে এসে ছায়ার মত সঞ্চার হলো নবদ্বীপের স্মৃতি। জানালেন তাকে শেষ সম্ভাষণ। বললেন মনে মনে—হে আমার নবদ্বীপ! হে আমার বাল্যের লীলাপীঠ, কৈশোরের কুঞ্জ বন, যৌবনের বন্ধু, সঙ্কীর্তনের তীর্থক্ষেত্র, হে আমার জননী, জন্মভূমি, বিদায়! বিদায়! বিদায়!

উদাস আকাশের বক্ষ দীর্ণ করে বেড়িয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস। আর্তকণ্ঠে রাতের পাখীরা উঠল একবার চিৎকার করে। বনানীর বুকে জাগল মর্মরী। প্রশান্ত গঙ্গা যেন কয়েকবার এসে আছড়ে পড়ল তটের বুকে। নিমাইয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আকুল-করা আর্তি—

হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

সব হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মায়ের অশ্রুধারা, হারিয়ে গেছে প্রিয়ার ব্যাকুল-করা কণ্ঠ। হারিয়ে গেছে ভক্তদের সম্মেলন। নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠার পরিতৃপ্তি। কিছু নেই! নিমাই উদ্‌ভ্রান্ত। অশান্ত। অধীর।

ত্রস্ত পদবিক্ষেপ। এগিয়ে চলেছেন গঙ্গার দিকে। শীত শান্ত রাত্রির হিম নির্ঝরের মধ্যে চলেছে অভিসার। মনের দিগন্তে প্রকীর্ণ হয়ে উঠেছে শ্যামশোভার সৌন্দর্য। ললাট-ফলক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দীপ্তি। যেন মনে হচ্ছে একটি বিরাট আলোকমণ্ডল ছুটে চলেছে।

গঙ্গার পারে এসে দাঁড়ালেন ক্ষণকাল। বুঝিবা আর একবার দেখে নিলেন নিমাই তার সাধের নবদ্বীপ। পড়লেন ঝাপিয়ে গঙ্গার বুকে। কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!

গঙ্গা পার হয়ে এলেন এপারে।

ঠিক তখনই শুনতে পেলেন নিমাই, শুনতে পেলেন বংশীধ্বনি। শুনতে পেলেন নুপুর-নিক্কণ। কৃষ্ণ-প্রেমের সায়র উঠল উদ্‌বেল হয়ে তাঁর চোখের সম্মুখে। ফুটল তাতে কৃষ্ণ কমল। নিমাই নিশীথ রাত্রির নীরব নির্জনে দ্রুত এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন কাটোয়ার পথে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার। দু হাতে হাতড়ালেন শয্যা—নিমাই নেই শয্যায়। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ডাকলেন ধরা গলায়, ওগো তুমি কোথায় গেলে ?'

কোনো উত্তর নেই। স্তব্ধ শান্ত রাত্রির বুকে পড়ছে তখন টপটপ করে শুধু শিশিরবিন্দু। আর কোন সাড়া মিল্‌লনা কিছুর।

শয্যা থেকে নিচে নামলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দরজাটা খোলা। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। দাঁড়ালেন এসে বারান্দায়। বললেন, 'তুমি কি বাইরে গেছ ?'

না, এবারেও কোনো সাড়া নেই। শব্দ নেই—আছে শুধু নিঃসঙ্গ শূন্যতা। আর আছে নিঃসীম রাত্রির নির্মম শীতার্তি।

ওরে নিঠুর যামিনী, তুমি তো দেখেছ ! বল, কোথায় আমার প্রভু ! কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাঁকে ?

চতুর্দিক থেকে যেন প্রতিধ্বনিত হলো—নাই, নাই, নাই !

শঙ্কাকুলা প্রিয়া। তবে কি, তবে কি আমার—

বক্ষপঞ্জরের মধ্যে আছড়ে পড়ল এসে কতগুলো খ্যাপা গঙ্গার ঢেউ। বুক ভেঙ্গে বেড়িয়ে এলো সাহারার হাহাকার। পাগলিনীর মত এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপ্রিয়া। দাঁড়ালেন এসে শচীদেবীর দরজার কাছে। ডাকলেন আকুল আকুতি ভরা কণ্ঠে—'মা, মাগো !'

চমকে উঠলেন শচী দেবী। সাড়া দিলেন রুদ্ধ দরজার অন্তরাল থেকে—'কে ?'

বিষ্ণুপ্রিয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'শীগ্‌গির দরজা খোল।'

এলোমেলো বসন শচীর। খেয়াল নেই সে দিকে। তাড়াতাড়ি এসে দরজার খিল খুলে বললেন, 'কি হয়েছে বৌমা ?'

উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'তোমার ছেলে কোথায় মা ?'

'সে কি !' শচীদেবীর মস্তকে যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলতে লাগলেন তিনি, 'কি বলছ বৌমা ? নিমাই ঘরে নেই ?'

বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর তখন প্রায় অবরুদ্ধ। তিরোহিত হয়ে গিয়েছে তাঁর কথা বলবার শক্তি। তবুও অনেক কষ্টে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে দেখি তিনি নেই।'

প্রদীপটি জ্বাললেন শচী। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। বুকের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সপ্ত সমুদ্রের নর্তন! সারাটা বাড়িময় খুঁজলেন। না, কোথাও নেই তাঁর সন্ধান। কেবল মাটিতে পড়ে আছে তাঁর পরিত্যক্ত বসন ভূষণ। তার পানে তাকাতেই অলক্ষ্যে শচীর কণ্ঠ থেকে বেড়িয়ে এলো, 'হায়, হায়, বুঝি আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

বুক ভেঙ্গে এলো কান্না। আর্ত শচী। অসহায় শচী 'বউমা বউমা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে তখন বাঁধনহারা অশ্রু। দুজনে এসে দাঁড়ালেন নির্জন পথের বাঁকে।

জনহীন পথ। এখনো লোক নামেনি পথে। হয়নি শুরু কর্ম-ব্যস্ততা। দু একটা পাখী ডাকছিল। আর ভেসে আসছিল গঙ্গা থেকে বিরহ-ব্যথিত একটা হিম শান্ত দীর্ঘশ্বাস।

বৃদ্ধা জননী। আর কিশোরী বধূ। নীরব রাত্রির নিঝুম নিথরে দাঁড়িয়ে ফেলতে লাগলেন চোখের তপ্ত অশ্রু।

রাজপথে হেটে চলেছেন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া। এতবড় পৃথিবীটার বুকে ক্ষুদ্র একটি মাটির দীপ জ্বেলে খুঁজছেন তাঁরা তাদের নিমাইকে। বারে বারে জননী শচীদেবী কান্নাকরুণ কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন, 'নিমাই, নিমাই!'

রাত্রির শেষ যাম। তার উপরে আবার কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। হিমস্পর্শে কেঁপে উঠছে শচীর কণ্ঠ। নিদ্রিত নগরীর কানে সে আহ্বান পৌঁছল না।

বিরাম নেই পথ চলার। সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধা জননী। বৃন্তচ্যুত কুসুম সন্ধানে পাগলিনীর মত চলেছেন পথে আর ডাকছেন আকুতি-ভরা কণ্ঠে—

'নিমাই, নি-মা-ই!'

বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে তাকিয়ে বললেন শচী, বললেন, 'ডাকো, তুমিও ডাকো মা।'

ডাকো! ডেকে ডেকে পাষাণকে গলিয়ে করো নির্গলিত ঝর্ণা। রাত্রির আঁধারকে করো দীর্ণ বিদীর্ণ। ডাকো আমার নিমাইকে। ডাকো আমার সেই অরুণ কনক দীপ্ত তরুণ তপনকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পড়লেন মহা বিপাকে। কি বলে ডাকবেন তিনি।

অন্তরের ভাষায় তাঁকে ডাকা যায় লক্ষ নামে। কিন্তু কণ্ঠে উচ্চারিত হবে কেমন করে? তাই বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'আমি কি বলে ডাকব মা?'

শচীদেবী তখনও ডেকে চলেছেন, 'নি-মাই!'

সাড়া নেই। শব্দ নেই। শীতার্ত রাত্রির নিঝুম নিস্তব্ধতার বুকে কে যেন চাবুক বসিয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে—নাই, নাই, নাই!

জননী শচীর আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ঈশানের। দরজা খুলে বাইরে এলো ঈশান। ত্রস্ত পদপাতে ছুটল। ডাকল উচ্চ কণ্ঠে, 'মা! মাগো!'

'মা' ডাক শুনে চম্‌কে উঠলেন শচী—ঐ, ঐ বুঝি আমার নিমাই।

কিন্তু না। ঈশান কাছে আসতেই মাতৃবক্ষের সকল আশা কোথায় যেন গেল ভেসে। শচী কপালে করাঘাত করতে লাগলেন বারে বারে। পড়লেন কান্নায় ভেঙ্গে। শুধালেন ঈশানকে—তোমরা দেখেছ তাকে? —আমার নিমাইকে?

রাত ভোর হয়ে এলো। পথে বেরিয়েছে দু-একটি লোক। ঈশান তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বাড়িতে। অদূরে শোনা গেল হরি হরি ধ্বনি। ওঁরা এদিকেই আসছেন। শচীদেবী বললেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাড়ির মধ্যে যেতে। তিনি বসে পড়লেন ওখানটায়ই।

উন্মাদিনী শচী। আলুথালু কেশ। এলোমেলো বসন। চোখ দুটি সিক্ত। আরক্ত। ধূলায় ধূসর হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত অঙ্গ।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ রোজ প্রত্যুষে যান গঙ্গা স্নানে। স্নানান্তে প্রভুকে দর্শন করেন,—প্রণাম করে ফেরেন যে যার বাড়িতে। আজও তাঁরা এলেন। এলেন স্নান না করেই। কারণ শচীদেবীর আর্তকণ্ঠ তাঁদের মনেও সঞ্চার করেছে চিন্তার। ফেলেছে বিষাদের ছায়া। তাড়াতাড়ি করে চলে এলেন—এলেন প্রভুর বাড়ির দিকে।

তাঁরা কাছে এলো জননী শচীর। ডুকরে কেঁদে ফেললেন তিনি। বললেন অসহায় আর্ত আবেদনে, 'আমার নিমাই কোথায়?'

শ্রীবাস, নিত্যানন্দ ও বাসু ঘোষ আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে। নীরব অশ্রুতে যেন ঝরে পড়তে লাগল সন্তপ্ত হৃদয়ের বেদনা। শচীদেবী আবার

হাহাকার করে উঠলেন, 'ওগো নিতাই, তোমাদের ছাড়া তো হয়নি কখনো নিমাই। বলো, কোথায়, কোথায় আমার নিমাই!'

একের পর এক সকল কথাই শুনলেন ভক্তবৃন্দ। দাঁড়ালেন গিয়ে একটু দূরে। এখন কি করা যায়—তাই নিয়ে একটু আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্দরে বসে ভাবছেন কত কথা। একের পর এক গত দিনকার ঘটনাগুলো পড়ছে মনে। স্নান করতে গিয়ে হারিয়ে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নাকের বেশর। সারাটা দিনই থেকে থেকে নেচে উঠেছে, নেচে উঠেছে বারে বারে ডান আঁখিপাতা। অথচ তখন খেয়াল হয়নি কিছু। বুঝতে পারেননি বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর ঘর আজই শূন্য হয়ে যাবে। যাবেন তাঁর মন্দিরের দেবতা তাঁদের ফাকি দিয়ে চলে। শুধু কি তাই? মনে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসর-ঘরে যাবার সেই রজনীটির অমঙ্গল মুহূর্তটির কথা। পায়ের আঙ্গুল কেটে গেল। কিন্তু তখন তো প্রভু বলেছিলেন— ও কিছু না। বলেছিলেন—এই যে আমি আছি তোমার সঙ্গে। ভয় কি?

কিন্তু সব আশ্বাস, আশা মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল! তাছাড়া প্রভু তো বলেছিলেন—তোমাদের না বলে যাব না আমি।

সে কথাটিও শেষে বিস্মৃত হয়ে গেলেন তিনি। নির্বাক বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু অন্তর যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। কান্নার মাঝেই খুঁজতে লাগলেন কান্না-হরণকে।

অশ্রু-সিক্ত নয়নে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন ভক্তবৃন্দ শচীদেবীর সম্মুখে। তখনও কাঁদছেন তিনি। বলছেন তাঁদের পানে তাকিয়ে, 'এনে দাও, এনে দাও, আমার নিমাইকে তোমরা এনে দাও!'

অন্দরে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া ফেলছেন নীরবে চোখের জল। আর কীই-বা আছে তাঁর সম্বল? কান্না দিয়ে যদি তাঁকে পাওয়া যায়। তিনি তো চোখের জল দেখে ঠিক থাকতে পারতেন না। যদি তুমি অন্তর্যামী, তবে আমার কান্নায় সাড়া দাও।

বাসু ঘোষ আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে। দেখছেন শচীদেবীর মর্মান্তিক বেদনার দুঃসহ প্রকাশ—

পড়িয়া ধরণীতলে শোকে শচীদেবী বলে
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।

অমূল্য রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
সোনার পুতলি গোরাচাঁদে ॥

* * * *

ভক্তদের মনে দৃঢ় ধারণা—প্রভু চলে গেছেন সন্ন্যাস নিয়ে। কি বলে তাঁরা প্রবোধ দিবেন শচী, বিষ্ণুপ্রিয়াকে? কোন্ পথে গেলে দেখা মিলবে প্রভুর? চিন্তাচ্ছন্ন ভক্তবৃন্দ। অন্ত নেই উৎকণ্ঠার। সবাই চাইছেন নদীয়া ছেড়ে যেতে। কিন্তু না, তা হয় না। বললেন নিত্যানন্দ, 'বলে ছিলেন প্রভু, যাবেন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর আশ্রমে। সন্ন্যাস নেবেন তাঁর কাছে। চলো সেখানেই আগে যাই।'

যদি সেখানে না পাওয়া যায়?

তবে ভারতবর্ষের প্রতিটি তীর্থে যাবে তাঁরা। খুঁজবে কেঁদে কেঁদে। যাবেন বৃন্দাবনে। যাবেন নীলাচলে, পাণ্ডুপুরে।

সকলেই হলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রস্তাবে সম্মত। জননী শচীদেবীর কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। প্রার্থনা করলেন আশীর্বাদ। বললেন নিতাই, বললেন শচীদেবীকে 'কেঁদোনা মা! আমি যেমন করে পারি প্রভুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। তোমার ছেলেকে এনে দেবো তোমারই কাছে। তোমারই কোলে।'

মায়ের পায়ে প্রণাম করে তাঁরা যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন কাটোয়ার কাঞ্চন নগরের পথে দণ্ডী কেশব ভারতীর তপোস্থলির উদ্দেশে।

'চন্দ্র শেখর আচার্য, পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর ॥
এই সব লইয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥'

নিত্যানন্দ, আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ও দামোদর পথে নামলেন। বেদনার সাগর শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীবাস। দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বীপ স্তম্ভের মত শচী, বিষ্ণুপ্রিয়ার পদ-তীর্থে।

বিরহের অশ্রু-নির্ঝরে ভাসছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীদেবী ফেলছেন চোখের জলের সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। তাঁদের মন্দির গিয়েছে শূন্য হয়ে। দেবতা নেই

ঘরে। কেমন করে দিন কাটবে? চতুর্দিকে নিঃসীম অন্ধকার। বেদনার বিভীষিকা। প্রকৃতির বুকেও যেন লেগেছে তারই ছোঁয়া। শুধু হাহাকার। শুধু সন্তাপ! দিন রাত বিলাপ করেন শচী—

"আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে॥"

পথে চলে অগুণতি লোক। তাদের মধ্যে সাধু সন্ত কি বৈরাগী দেখলেই হলো। অমনি এগিয়ে যান শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া থাকেন উৎকর্ণ হয়ে। সুধান শচী আকুল-করা কণ্ঠে—'ওগো, তোমরা দেখেছ আমার নিমাইকে?…এক নবীন সন্ন্যাসী?'

—দেখেছি।

—দেখেছ! কোথায়?

—কাঞ্চন নগরে কেশব ভারতীর আশ্রমে তাঁকে দেখেছি। আহা কি রূপ! সাক্ষাৎ জগন্নাথ।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে যে যার পথে চলে যায়। কথাগুলো ভেসে আসে বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে। প্রবেশ করে মরমে। বড় দুঃখে তিনি উঠেন বিলাপ করে—

"নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেহ হেন জন, আনিবে তখন আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়ি যায়॥

চোখে ঘুম নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। মুখে নেই অন্ন। সারাটা রাত কাটিয়ে দেন বসে বসে। তাকিয়ে থাকেন বাতায়নের পথে। পাতার শব্দ হলে ওঠেন চমকে। ভাবেন—বুঝি প্রভু ঐ এলো!

আকাশে বায়ু বয়। ঝরে পড়ে শিশির-বিন্দু। প্রিয়ার জড়িমা-জড়িত মন আকুল হয়ে যায়। তাকান বাইরের পানে। মন বলে—ঐ, ঐ, বুঝি সে এলো!

কিন্তু না। কিছু নয়। শুধু বাতাস। আবার শুয়ে পড়েন বিষ্ণুপ্রিয়া। ফেলেন দীর্ঘশ্বাস। বক্ষ যেন যায় শূন্য হয়ে। কি লয়ে থাকবেন ঘরে? কি করে দেখাবেন মুখ। কারো সাথে বলেন না কথা। মুখ দেখান না কাউকে। গিয়েছে দেহ ক্ষীণ হয়ে। আর হবেই বা না কেন?

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥

জননী শচীদেবীর অনুরোধে খান তাঁরই পাতের প্রসাদ, খান পাখীর মতন খুটে খুটে। কোনো মতে কষ্টে ক্লিষ্ট আয়ুর ঋণ পরিশোধ করে চলেছেন প্রিয়া।

ও দিকে কাঞ্চন নগরে মহা সমারোহ। চব্বিশ বছরের যুবক গৌর সুন্দরের হাতে তুলে দেন কেশব ভারতী অরুণবরণ বহির্বাস। তুলে দেন ডোর ও কোপীন। কানে রাখেন সন্ন্যাসের মন্ত্র। কাছে ডেকে বলেন ভারতী, বলেন নিমাইকে—'তুমি জীবের জীবনে এনে দিয়েছ কৃষ্ণ চেতনা। তোমার সমগ্র চৈতন্যে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কৃষ্ণ নয় তো কি? আজ থেকে তোমার নতুন নাম হলো—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।'

নাম প্রেম সম্বল করে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসীর বেশে এসে দাঁড়ালেন পথে। জীবের দুঃখে একদিন স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী পত্নীকে ছেড়েছিলেন। আজ আবার বসন, ভূষণ, আহার, নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে নিমাই নামটি পর্যন্ত ত্যাগ করলেন। বাঙলার প্রাণের ঠাকুর চোখভরা অশ্রু ও বুক-ভরা বেদনা নিয়ে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলতে বলতে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন।

—আমি বৃন্দাবনে যাবো। বৃন্দাবন কতদূর!

অচেনা পথ। অজানা দেশ। শুধু অন্তর নিকুঞ্জে কেবল ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুরব, আর যমুনার উজান উচ্ছ্বাস থেকে থেকে তাঁকে পাগল করে দিচ্ছে। পাগল করে দিচ্ছে সেই প্রেমসুন্দরের মুরলীধ্বনি। প্রেমোন্মাদ শ্রীচৈতন্য দ্রুত এগিয়ে চললেন বৃন্দাবনের পথে।

পেছনে পেছনে ছুটে আসছেন ভক্তবৃন্দ। তাদের পেছনে অসংখ্য নর-নারী। আকুলকরা কণ্ঠে তারা ডাকলেন তাদের প্রেমের ঠাকুরকে। কিন্তু কে শোনে? কে দাঁড়ায়? ভক্তবৃন্দ এসে ধরে ফেললো তাঁদের

প্রিয় প্রভুকে। জ্ঞানহীন। মত্ত চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে পাগল। নিতাই নানা ছলে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। ফিরিয়ে আনলেন বৃন্দাবনের নামে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে।

সংবাদটি পৌঁছল গিয়ে শচীদেবীর কানে। নিতাই পাঠালেন সংবাদ। শুধু সংবাদ নয়—স্বয়ং গিয়ে হাজির হলেন জননীকে আনবার জন্যে। প্রভুর হুকুম।

সমস্ত নদীয়া নগরে সেদিন সাড়া পড়ে গেছে। সকলের চোখেই জল। শত্রু মিত্র ভেদাভেদ নেই। প্রভুর বিরহে আবালবৃদ্ধবনিতা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আজ তাদের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। আনন্দে, দুঃখে ও হর্ষে পুলকপ্রাণ নদীয়াবাসী, দলে দলে ছুটেছে শান্তিপুর অভিমুখে। ছুটেছে তাদের প্রিয় নিমাইচাঁদকে দর্শন করতে।

এদিকে তৈরী হয়ে নিলেন শচীদেবী। দোলা প্রস্তুত। অদূরে তাকিয়ে সকলের চোখ গেল স্থির হয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া আসছেন এদিকেই। সঙ্গে কাঞ্চনা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন দোলার কাছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বুকের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রলয় নর্তন। কেন? প্রভুর যে আদেশ নেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যেতে। দর্শকবৃন্দও অপলক তাকিয়ে। তাদের মনেও নানা প্রশ্নের প্রভঞ্জন। এমনি এক করুণ মুহূর্তে নিত্যানন্দ আনত মস্তকে বললেন, 'শ্রীমতীর যাবার আজ্ঞা নেই।'

একটা বজ্রপাত হলো। বিষ্ণুপ্রিয়ার ইন্দ্রিয়গুলো যেন একবার তীব্র চিৎকারে হাহাকার করে উঠতে চাইল। দুচোখ বেয়ে নামল অশ্রুর প্লাবন। যে পথে এসেছিলেন প্রিয়া, সেই পথেই সখীর হাত ধরে ফিরে গেলেন। সবাই যায়। সকলেরই আছে যাবার আদেশ। শুধু বিষ্ণুপ্রিয়ার বেলায় প্রভু এমন কঠোর, কঠিন নির্দয় হলেন কেন? তবে কি প্রভু সত্যিই চিরজন্মের মত ত্যাগ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে? আর এ মুখ তিনি দেখবেন না? তাঁর স্ত্রীবলে পরিচয় দেবার অধিকারটুকু থাকবেনা বিষ্ণুপ্রিয়ার? কিন্তু কেন? কেন এ নির্দয় নির্যাতন?

বসে পড়লেন শচীদেবী মাটিতে। বললেন নিতাইকে,—তুমি ফিরে যাও! যদি এ অভাগিনী না যেতে পারে, 'তবে আমিও যাবো না।'

যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, আর পারল না তারা ধৈর্যের কাঠিন্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে। কান্নার সঙ্গে তারা স্মরণ করতে লাগলেন প্রভুকে।

এই তো সেই পরম লগন। বলেছিলেন প্রভু, 'তুমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না।'—আজ বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে জীবকে কাঁদাচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জলের অজস্র ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে জীব-চিত্তের মালিন্য। তারা হয়েছে আবিলমুক্ত। প্রিয়ার ব্যথার ব্যথী। প্রিয়ার ব্যথার ব্যথী হওয়া মানেই তো প্রেমজনের জন্যে কাঁদা। আর সে প্রেমজনটি কে? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কাঁদো, তুমি কেঁদে জীবকে কাঁদতে শেখাও। দাও তাদের কানে কান্নার মন্ত্র। শোনাও কৃষ্ণ-কথন। কৃষ্ণ-কীর্তন। জীব-জীবনে নিয়ে এসো গৌর-বিরহের বেদনা।

শচীদেবীর পানে তাকিয়ে বললেন প্রিয়া কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে—তুমি যাও মা। তুমি না গেলে তিনি যে ব্যথা পাবেন। আমার কোনো দুঃখ নেই। তাঁর ধর্মপথে আমি সঙ্গী না হয়ে হবো অন্তরায়? তা কি হয়। তিনি যে তাঁর ধর্ম রক্ষা করেছেন। তাঁর সুখসাধন করাই তো আমাদের কর্তব্য মা!

তোমার সুখ, তোমার শান্তি, তোমার তৃপ্তির চেষ্টা মেটাতে আমি রইলেম বজ্রে বেঁধে বুক। তুমি সুখে থাকো, তুমি ভালো থাকো, জীবকে মধুমাখা নাম, প্রেম দিয়ে ধন্য করো—এই শুধু দুঃখিনীর ভিক্ষা!

নিত্যানন্দ যাত্রা করলেন শচীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে। শূন্য ঘরে পড়ে রইলেন বঞ্চিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। বিলাপ করতে লাগলেন ব্যথিত অন্তরে—বিলাপ করতে লাগলেন কেঁদে কেঁদে।

"এ ঘর জননী ছাড়ি মুঞি অনাথিনী করি
কার বোলে করিলে সন্ন্যাস।"

যুগে যুগে তুমি এসেছো বিরহের লীলা খেলা খেলতে। কিন্তু আমার মতো আর তো কাউকে তুমি কাঁদাওনি। কত চোখের জল ঝরলে ধুয়ে যাবে জীব-জীবনের মালিন্য? কত কাঁদলে মিলবে তোমার

দর্শন? আমি যে ভাবতে পারিনা তোমার অদর্শন। ভাবতে পারিনা ও পদযুগলের সেবা-বিরতি। যদি তোমার চরণ সেবারই অধিকার না পেলাম—তবে এ জীবনের স্বার্থকতা কোথায়? কোথায় গো সফলতা?

ওদিকে শচীদেবী পুত্রকে টেনে নিয়েছেন কোলে। যেন তাকাতে পারেন না শচী নিমাইয়ের পানে। চাচর কেশ নেই তার মাথায়। পরণে কৌপীন। সন্ন্যাসীর বেশে মায়ের পানে তাকিয়ে নিমাইও যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর জীবনের সেরা সম্পদ এই জননী। কত দুঃখ, কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন তিনি নিমাইকে। জীবনে তো আঘাত সংঘাত কম পাননি তিনি! কিন্তু সব বেদনাকে ভুলে ছিলেন তিনি তাঁর বুক জোড়া সন্তান নিমাই চাঁদকে পেয়ে। তাই তো নিমাই মায়ের কথা স্মরণ করে বললেন। বললেন ভক্তদের কাছে—'মা যা বলবেন, আমি তাই করব। যদি তিনি আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিতে চান, আমি তাই যাব। আবার সংসার রচনা করব। তবুও মাকে আমি দুঃখ দিতে পারব না।'

বেদনাহত ভক্তদের অন্তর নৃত্য করে উঠল। কোন্ মা পুত্রকে সন্ন্যাস নিতে অনুমতি দেয়? তাছাড়া শচীদেবী। তিনি তো কিছুতেই এ কথা বলতে পারেন না।

আনন্দচঞ্চল ভক্তবৃন্দ এলেন শচীদেবীর কাছে। বললেন—এবারে নেও মা তোমার ছেলেকে আবার ঘরে। তুমি যা বলবে তাই করবেন প্রভু।

শচীদেবী শুদ্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কি যেন ভাবলেন। এ যে প্রভুর মায়ার খেলা। এ ও এক লীলাই বটে। জগৎ ও যুগকে আজ তিনি আদর্শ জননীর কর্তব্য ও নিষ্ঠার মহাব্রত দর্শন করাবেন। তাই তো নিমাই সব-কিছু মায়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র আদেশের অপেক্ষায় রইলেন।

কিন্তু শচীদেবী বললেন—'না, তা হয় না। নিমাইকে আমি মানুষের কাছে নিন্দার পাত্র করে তুলতে পারি না। জীবকল্যাণে যখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, তখন ঐ-ই তার পথ। তাছাড়া নিমাইয়ের ইচ্ছাও তাই।'

বজ্রাহতের মত ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ হলেন। ফিরে গেলেন তাঁরা। জগজ্জননী জীবের হিত সাধনার্থে আপন পুত্রকে জগৎ মাঝে বিলিয়ে দিলেন।

নিমাই এ সংবাদ শুনে পরম খুশী। পরম তৃপ্ত।

বললেন তিনি ভক্তদের পানে তাকিয়ে, 'মাতৃ আজ্ঞাই শিরোধার্য। দু-তিন দিন পরেই আমি যাত্রা করবো নীলাচলে।'

দেখতে দেখতে কেটে গেল দু-তিনটি দিন। এবারে নিমাই এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'অনুমতি দাও মা! আমি নীলাচলে যাই!'

থর থর করে কেঁপে উঠল শচীর বক্ষ। স্নেহাতুর মনটা তাঁর হাহাকার করে উঠল। তবুও তিনি বললেন, বললেন আকুলকরা কণ্ঠে, 'যাও বাবা, নীলাচলে গিয়েই তুমি থাকো! কিন্তু ভুলিস নে তোর এই দুঃখিনী জননীকে!'

আর পারলেন না শচীদেবী ধৈর্য ধরতে। দু'চোখে অঝোর ধারায় নামল জল। দীর্ঘশ্বাসে চাইল বুক ভেঙ্গে যেতে। নিমাই মায়ের পায়ে প্রণাম করলেন। বললেন মায়ের পানে তাকিয়ে—'তুমি যখনই আমাকে স্মরণ করবে মা, তখনই আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াব।'

আর কোনো কথা নয়। শচীর নিমাই চাঁদ, জীববন্ধু জগৎপতি জীবের কল্যাণে পথে নামলেন। পাঁচজন ভক্ত প্রভুর সঙ্গে চললেন। শচীদেবী হায় হায় করে লুটিয়ে পড়লেন ধূলিতে। ডুকরে কাঁদতে লাগলেন—ওরে আমার নিমাই! তোকে আমি নিজে বিদায় করে দিলেম! হায়, হায়, এ কি করলেম আমি!' ভক্তবৃন্দ ও চিরবিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোকসাগরে ভাসিয়ে প্রভু যাত্রা করলেন নীলাচলে।

॥ চব্বিশ ॥

স্মৃতির ছিন্ন পত্রগুলো মেলাতে বসে বারে বারেই যায় হিসেবে ভুল হয়ে। কখন্ যে জীবনের 'পর দিয়ে কেটে গেল আঠেরোটা বছর—তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। জীবনের শুরু থেকে সমাপ্তির অন্তপর্বটি কান্না দিয়েই কি ভ'রে দিতে হবে? দিনের দুয়ারে কতবার এসে আছড়ে পড়ছে দুখের যামিনীরা। রুখতে চেয়েছেন প্রবল প্রতিরোধে তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো কে? ওরা যেন ঝড়ের মত এলো। গ্রাস করল বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের আকাশ খানাকে। অন্তরে লেগে রইল নিরন্তর। যেতে ওরা চায় না। বুঝি যাবেও না কোনো দিন!

দীর্ঘ পাঁচটা বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। শান্তিপুর ছেড়ে গিয়েছেন প্রভু নীলাচলে। যাবার প্রাক্কালে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন সকলকে—

কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥ চৈঃ মঃ

বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বল বলতে শুধু এই তো। আর কি আছে তাঁর? আছেন বৃদ্ধা শাশুড়ী। দিনরাত তিনি বলেন গৌর-কথা। কৃষ্ণকে ভজনা করতে বসেন। কিন্তু মনের থেকে উৎসারিত হয় নিমাই! নিমাই! নিমাই নামেই শচীদেবী ডাকেন তার ভগবানকে। অন্তর্যামী অমনি এসে দাঁড়ান জননীর সম্মুখে। বিমোহিত করেন আদিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে তাঁর তনুভা। আবার পরমুহূর্তেই তলিয়ে যান শচী। তলিয়ে যান যেন কোন্ গহন ঘন অন্ধকারে! তাই তো তিনি কাঁদেন। জেগে থাকেন রাত্রির বাসরে। ধেয়ে যান পূজার মন্দিরে। নিবেদন করেন অন্ন ব্যঞ্জন। করেন প্রার্থনা করজোড়ে। বলেন মনে মনে—হে করুণাঘন, হে কৃষ্ণ, হে আমার নিমাই শুধু একবার তুই দেখা দে! একবার এসে খেয়ে যা অভাগীর নিবেদিত অন্ন!

এমনি করে কাটে দিনের পর দিন। রাত ভোর হয়। শচীদেবীর হাত ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া যান গঙ্গাস্নানে। সঙ্গে থাকে চির-পুরাতন সেবক ঈশান।

স্নানান্তে বাড়ি ফেরেন। যান শচী বাগানে। চয়ন করেন ফুল। ঢোকেন দেব-মন্দিরে। কান্নার মন্ত্রে ডাকেন তাঁর নিমাইকে। কখনো যান পাগলিনীর মত হ'য়ে। কি বলতে কি বলেন থাকে না খেয়াল।

বলি বিষ্ণুপ্রিয়ার কি কম বেদনা? অন্তর পুড়ে যাচ্ছে অহরহ। কিন্তু বাইরে নেই তার প্রকাশ। কেন? যদি দেখেন শচীদেবী প্রিয়ার বিভ্রান্ত ভাব, তবে যে তিনি আরও যাবেন পাগল হয়ে। তাই তো প্রিয়া কাঁদেন না উচ্চ কণ্ঠে। নীরবে ফেলেন দীর্ঘশ্বাস। মোছেন চোখের জল। দুঃখাগ্নির জ্বলন্ত শিখাকে নির্বাপিত করেন বুক বেঁধে কঠোরে। কিন্তু তার ফলে হলো কি? শীর্ণ হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার পেলব মধুর দেহ। কাচা সোনার বর্ণে লাগল ম্লানিমার ছোঁয়া। নয়নপারে প্রকাশ পেল কালীর আলিম্পন। কবরী গেল খুলে। কটা হলো কালো দিঘল কেশ। যেন তাকান যায় না। কি করেই বা তাকান যাবে? অন্তরভরা যার আতুর আবেদন, মনভরা যার বেদনার বিষ—তাঁর দেহই-বা কেমন করে মুক্তি পাবে এ দহন থেকে? বৈচিত্র্যহীন প্রিয়ার জীবন। নেই জীবন-নদীতে কোনো কলগুঞ্জন। যেন সব বলয় বন্ধনে আবদ্ধ। স্মৃতির বাসরে শুধু মাত্র একটি প্রহরী মন লয়ে দুঃখের শিয়রে আর কদিন জেগে থাকা চলে? কিন্তু আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন কি হয়েছে। সকাল থেকেই উন্মনা—কঠোর, কঠিন। ঠিক এমনটি দেখা যায়নি কখনো তাঁকে। কে যেন তাঁর বদ্ধ জলাশয়ে মেরেছে একটি ঢিল। তরঙ্গ উঠেছে। উঠেছে প্রশ্নের প্রভঞ্জন—'ওগো, তুমি কি আমার জন্যেই ঘর হারা, দেশ ছাড়া হয়েছ?'

যদি তাই হয়, তবে আমি কেন সুখের উপাধানে মাথা দিয়ে পা রাখব স্বাচ্ছন্দ্যের পালঙ্কে? আমিই বা কেন হব না সন্ন্যাসিনী, যোগিনী?

ঘরে নেই শচীদেবী। গিয়েছেন মন্দিরে। ঘরে আছেন একাকিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। ছিলেন শুয়ে মাটির শয্যায়। উঠে বসলেন। খুললেন সোনার অঙ্গ থেকে সোনার অলঙ্কার। ছেড়ে ফেললেন পট্টবাস। পরলেন গৈরিক বসন। সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করলেন গৈরিক আচলে। মুছে ফেললেন নয়ন-বারি। আর কান্না নয়। তবে?

এবারে রসবল্লভা হবেন যোগিনী। শক্তিমান করবেন প্রাণবল্লভকে। একাধারে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই রূপ। কান্না দিয়ে নির্গলিত করছেন কঠোর

জীবের প্রাণ। আর কৃচ্ছ্রব্রতের তপশ্চর্যায় এগিয়ে যাবার শক্তি যোগাচ্ছেন শ্রীচৈতন্যকে। ওঁ কি যে সে? বিষ্ণুপ্রিয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্বশক্তির মূলাধার। সর্বশক্তি-গরীয়সী। প্রিয়া যদি পিছু টানেন, তবে কি গৌর এগিয়ে যেতে পারেন?

ধ্যানাসনে তন্ময় বিষ্ণুপ্রিয়া। মগ্না। ডুবে গিয়েছেন অতল গভীরে। নিমজ্জিত হয়েছেন প্রভুর রূপ মধুরে। নিমজ্জিত হয়েছেন যোগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রিয়ার অমেয় শক্তি সরসীতে প্রভাস্বর হয়ে উঠলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

ঠিক তখন এসে হাজির হলেন প্রিয়ার সখী কাঞ্চনা। গেলেন অবাক হয়ে। নির্বাক কাঞ্চনা। তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে আছেন ভীতি-বিহ্বল নয়নে। শঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর বক্ষ। যেন নিথর হয়ে এলো সর্বাঙ্গ। আর দাঁড়াতে পারলেন না তিনি। ছুটে গেলেন শচীদেবীর কাছে। বললেন কম্প্র কণ্ঠে, 'মা, মাগো! একবারটি এসো। দেখে যাও তোমার পুত্র-বধূকে। ধ্যানাসনে সমাসীন প্রিয়া। নিথর, নিস্তব্ধ। খুলে ফেলেছে অঙ্গ থেকে অলঙ্কার। পরেছে গৈরিক। সারাটা অঙ্গে মেখেছে ভস্ম। আমি তাকাতে পারিনে। ওকে যেন পাগলিনীর মত দেখাচ্ছে মা!'

কাঞ্চনার চোখে এলো জল। জল এলো শচীদেবীর চোখেও।

এলেন ছুটে। টেনে নিলেন কোলে। ধীর কণ্ঠে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন শচী। সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তাঁর প্রিয় পুত্র-বধূকে, 'মা, তুমি তো মা।' জগতের মা। জীবের মা। মায়ের চোখে জল দেখে সন্তান কাঁদবে। 'তোমার স্বামী যে জীবের মঙ্গলের জন্যে আমাদের কানে দিয়ে গেছেন কান্নার মন্ত্র। তুমি প্রাণ ভরে কাঁদো। আমিও তোমার সঙ্গে কাঁদি। ওগো, রোদন আমাদের ভজন। এ ভজন তুমি কেন ছাড়লে মা?'

শচীদেবী প্রিয়াকে টেনে নিয়ে এলেন কঠোর থেকে কোমলে। প্রিয়ার অন্তর-নিরুদ্ধ বিষ-বেদনা যদি না কান্নার জলে ধুয়ে যায়—তবে যে পাগল হয়ে যাবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই শচীর এ প্রয়াস।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দু'চোখে শুরু হলো ধারা বর্ষণ। পড়লেন মূর্চ্ছিত হয়ে।

কাঞ্চনা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। আহা, বিরহিনী বুঝি বিরহ সন্তাপে দেহত্যাগ করল! উচ্চস্বরে গৌরাঙ্গের নাম করতে লাগলেন কাঞ্চনা। নাম করতে লাগলেন প্রিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে। গৌর-বিরহ-ব্যাধির এ যে অমোঘ ওষুধ। যে নাম চিন্তনে অচেতন, সেই নাম শ্রবণেই আবার ফিরে আসে জাগরণ। এ যেন ব্রজের গোপী কৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীরাধার জ্ঞান ফিরিয়ে আনছেন।

জ্ঞান ফিরে এলো বিষ্ণুপ্রিয়ার। ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। সখী কাঞ্চনা আশ্বস্ত করলেন প্রিয়াকে। বললেন, 'কাঁদিসনে সই। তোর প্রাণবল্লভ শীগ্‌গিরই ফিরে আসবেন। জননী ও জন্মভূমিকে দর্শন করতে আসবেন যে!'

উত্তপ্ত গোবি-সাহার বুকে এ যেন এক পসলা চেরাপুঞ্জির বর্ষণ। হত চকিত বিষ্ণুপ্রিয়া। শুধালেন বিগলিত কণ্ঠে—সত্যি বলছিস, তিনি আসবেন?

কি যেন ভাবলেন ক্ষণমুহূর্ত। বলতে লাগলেন তারপরে—'তিনি যে আমার জন্যই হয়েছেন গৃহত্যাগী! এ পাপিনী জীবিত থাকতে তিনি কি নদীয়ায় ফিরে আসবেন?'

নিশ্চয়ই আসবেন।

একটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর-জিজ্ঞাসা, 'এমন দিন কবে হবে রে কাঞ্চনা?'

বললেন কাঞ্চনা, 'দামোদর পণ্ডিত যে খবর নিয়ে এসেছেন। প্রভু কয়েক দিনের মধ্যেই নদীয়ায় আসছেন।'

পাঁচ বছর। দীর্ঘ পাঁচটা বছর পরে ফিরে আসছেন গৌরগুণমণি। ফিরে আসছেন জন্মভূমি নবদ্বীপকে দর্শন করতে। এ নিয়ম পালন করতে হয় সন্ন্যাসীকে। তাই তো প্রভু আসছেন।

সংবাদটি পড়ল ছড়িয়ে। ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ার মত। নবদ্বীপের আকাশ, মাটি, মন গুণতে লাগল দিন উৎকণ্ঠায়। তাকিয়ে রইল আকুল অগ্রহে। সংবাদটি নিয়ে এসেছেন দামোদর পণ্ডিত। গিয়েছিলেন তিনি প্রভুকে দর্শন করতে। আরো নিয়ে এসেছেন তিনি। কি?

প্রিয়ার জন্যে প্রভুর প্রেরিত পট্টবাস, শচীদেবীর জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ। শচীদেবী তা পেয়ে পরম খুশী। আত্মহারা হয়ে গেলেন আনন্দে। ডাকতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বললেন ব্যগ্র কণ্ঠে, 'ওরে ও বিষ্ণুপ্রিয়া, কোথায় গেলি? এই ছাখ নিমাই কত কি পাঠিয়েছে। নে, ধর, এখনই ও দুখিনী বেশ ছেড়ে শাড়ী পড়ে আয় গে, যা!'

শাড়ীখানা হাত পেতে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। একটু আড়ালে গিয়ে ধরলেন তা বুকে চেপে। দু'চোখ ছেপে এলো জল। চলে এলেন অন্দরে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কি আনন্দের সীমা আছে? সন্ন্যাসী হয়েও প্রভু বিস্মৃত হননি তাঁর প্রিয়াকে। রেখেছেন মনে। পাঠিয়ে দিয়েছেন তারই জন্যে শাড়ী। এ যে অপূর্ব লীলা। অন্তহীন ধারা। এখানেই আমরা দেখতে পাই নদীয়া-লীলার স্বাতন্ত্র্য। দেখতে পাই গৌর সন্ন্যাসীর স্বকীয়তা।

এদিকে সন্তানের আগমন সংবাদে শচীদেবী পাগলপ্রায়। বসে থাকেন অলিন্দে। শুধান পান্থজনকে—কতদূর এলো নিমাই? তোমরা তাকে দেখেছ কেউ?

রাত্রির বাসরে জাগর নয়নে থাকেন বসে। সহসা ওঠেন চমকে। ডাকেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বলেন, 'বউ নিমাইকে একবার এ ঘরে পাঠিয়ে দাও তো।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিভ্রম লাগে। হা করে তাকিয়ে থাকেন শাশুড়ীর পানে। চিত্তের চত্তরে ঝাপিয়ে পড়ে বাণবন্যা। অস্থির উন্মত্তের মতো তিনি ওঠেন ডুকরে।

সম্বিৎ ফিরে আসে শচীদেবীর। সম্বিৎ ফেরে প্রিয়ার ব্যাকুল আকুলিতে। বলেন তখন, বলেন শচীদেবী, 'বৃদ্ধা হয়েছি মা। কি বলতে যে কি বলি খেয়ালও থাকে না।'

প্রতিদিন ছেলের জন্যে রন্ধন করেন শচী। নিমাইয়ের উদ্দেশে করেন নিবেদন। শুয়ে পড়েন শয্যায়। আসে একটু তন্দ্রা। ঘুমে জড়িয়ে আসে দুটি নয়ন। অমনি এসে হাজির হন নিমাই। হয় স্বপ্ন দর্শন! মায়ের দেওয়া ব্যঞ্জন পরম তৃপ্তিভরে খেয়ে যান নিমাই। দূর করেন মায়ের মনের দহন জ্বালা।

কখনো বা দেখেন নিমাইকে শ্রীবাসের বাড়িতে। এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ভাত। শচী ছুটে আসেন সেখানে। ডাকেন সখী মালিনীকে। বলেন, 'ওরে সই মালিনা, আমি যে কখন রেঁধে বসে আছি। ভাত যে ঠাণ্ডা হল। নিমাই এসেছে তোদের বাড়িতে ?'

মালিনী বিমূঢ়ের মত হা করে তাকিয়ে থাকেন। শচী ধীরে ধীরে নেমে আসেন সহজে। ছুটে যায় তাঁর আবেশ। করে ওঠেন হাহাকার।

এমনি করে দিন বয়ে যাচ্ছিল শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার। দিন বয়ে যাচ্ছিল বেদনে ক্রন্দনে আর্তিতে ও অশ্রুতে। বিধি বুঝি মুখ তুলে চাইলেন !

সকাল। পূর্ব দিগন্তে ভাস্বর হয়ে উঠেছে অরুণোদয়ের সূর্য। পাখীরা ডাকছে শাখে শাখে। নির্মল আকাশ। কোথাও নেই বিন্দু-মালিন্য। বড় ভালো লাগে শচীর। ভালো লাগে আজিকার এই নীল দিগন্তের অন্তহীন ব্যাপ্তির পানে তাকিয়ে। ঐ উদার ব্যাপ্ত অসীম যেন আজ শচীর সীমান্বিত পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দিয়ে যাচ্ছে নিত্যধামের সংবাদ। সহসা দিঙমণ্ডল মুখর হয়ে উঠল। মুখর হয়ে উঠল হাজার হাজার কণ্ঠে গৌরসুন্দরের বিজয় নির্ঘোষে—জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়।

উপনীত হয়েছেন প্রভু নদীয়ার উপকণ্ঠে। আছেন তিনি নদীয়া নগরে। কিন্তু শচীদেবী আর পারলেন না সীমা স্বর্গে আবদ্ধ রইতে। ছুটে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে। সঙ্গে ঈশান। লোকে লোকারণ্য। চলেছে তাঁরা, চলেছে তাঁদের প্রাণের প্রাণ নিমাইচাঁদকে দর্শন করতে।

শচীদেবীর কি ভাবনার অন্ত আছে ? কত ভাবনা তাঁকে এই মুহূর্তটায় দলে পিষে যাচ্ছে। ভাবছেন তিনি—হয়ত নিমাই জন্মভূমি দর্শন করেই বিদায় নেবে। সন্ন্যাসীর তো স্ত্রীর মুখ দেখতে নেই। কিন্তু তা বলে বিষ্ণুপ্রিয়া কেন পতির চরণ দর্শনে হবে বঞ্চিতা ? তা হয়না। জনমের মত একবার দেখে নিক প্রিয়া তার প্রাণবল্লভের চরণ কমল।

গঙ্গার অপর পারে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রভু। এ পারে শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। বৃদ্ধা শচী। বয়স হয়েছে বাহাত্তর বছর। হাত পা কাঁপছে থর থর করে।

তার চেয়েও কাঁপছে তাঁর অন্তর অধিক। এত ভীড় ঠেলে এসেও কি পাবনা তোর দেখা ?

লাখো লাখো কণ্ঠের কল-কল্লোলের মধ্য থেকে প্রতিধ্বনিত হলো একটি বাক্য—ঐ প্রভু! ঐ প্রভু!

এপার থেকে দৃষ্টি বিসারিত হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার ওপারে। অগুণতি জনতার মধ্য থেকে প্রস্ফুটিত হলো একটি কমল-স্নিগ্ধ বদন। বিষ্ণুপ্রিয়া এক পলক দেখে নিলেন। দেখে নিলেন তাঁর অন্তরসুন্দরকে। কিন্তু এ কিরূপ? কই, কোথায় সেই চাচর কেশ! কোথায় সেই নাগর কান্তি! বাঁধ মানল না চোখের জল। অজস্র অশ্রুর উচ্ছ্বাসে প্রিয়ার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। ওদিকে জনতাও প্রভুকে নিয়ে চলে এল অদর্শনে।

বাড়িতে ফিরে এসেছেন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া। চতুর্দিকে মহা সমারোহ। শচীর ঘরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস। কই, নিমাই তো এখনো এলোনা! 'ওরে নিমাই, তুই একবারটি দেখা দিয়ে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দে!'

শচীর বিলাপে প্রিয়া ঠিক থাকতে পারেন না। নানা প্রশ্নের প্রভঞ্জনে পড়েন ভেঙ্গে। জীবনটার ওপর আসে অবহেলা। লাগে যেন বিস্বাদ।

কাঞ্চনার পানে তাকিয়ে বললেন, বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'সইরে, প্রভু বুঝি আমার জন্যেই আসছেন না মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বল, এ জীবন রেখে কি লাভ! এর চেয়ে আমার মরণ ভালো!'

কাঞ্চনা অভিসিঞ্চিত করেন তাঁর প্রিয় সখিকে। অভিসিঞ্চিত করেন প্রশান্তির পয়োধারায়। বলেন, 'তোর ভাবনা অলীক। ও কি কথা!'

প্রিয়া ভাবেন,—তবে কেন প্রভু আসছেন না?

ওদিকে শচীদেবী আর নেই সেই শচীদেবী। হয়েছেন উন্মাদিনী। বেদনার হিমেল বন্যায় বিশুষ্ক তাঁর তনু। নয়নে অবিরল ধারে ঝরছে কান্নার অশ্রু। আর কি করে থাকবেন তিনি ঘরে? সমস্তটা চেতনার মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করছেন তিনি তাঁর সোনার টুকরো ছেলে নিমাইয়ের সাবয়ব সমুপস্থিতি। তাইতো ঘর থেকে নামলেন পথে। দ্রুত পদবিক্ষেপ। দুরন্ত গতি। কোথায় যাচ্ছেন তিনি? যাচ্ছেন শুক্লাম্বর

ব্রহ্মচারীর বাড়িতে। কেন? নিমাই এসে উঠেছেন সেখানে। তাঁরই দর্শন অভিলাসে ছুটেছেন শচী। বলছেন পথের লোকদের ডেকে ডেকে, 'এই শোন, নদীয়ায় নিমাইচাঁদ এসেছে। তোমরা তাকে ধরে রেখো! আর যেতে দিওনা!'

এদিকে প্রিয়াজী আর কাঞ্চনা মুখোমুখী বসে। বলছেন প্রিয়া তার দুঃখের ইতিকথা। নীরব কাঞ্চনা। কি-ইবা জবাব দেবেন? এ যে বিশ্ব-চিত্তের বেদন বিলাপ। জীব-জীবনের বিরহ ক্রন্দন। কাঞ্চনাও যে তার সখির বিরহ বেদনা দেখে বিমূঢ়। বেদনক্লিষ্টা। রোদনরতা।

কি ভেবে বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'না গো না, আমি মরব না সখি! মরে গেলে শুনতে পাবনা প্রাণবল্লভের গুণগাথা লীলাকথা!'

হে প্রাণহরণ, তুমি বিদূরিত করো চিরবিরহিনীর রোদনভরা জীবনের অশ্রু-নির্ঝর! আমি জেগে রইলেম শুধু তোমার কুশল সংবাদের প্রতীক্ষায়। জেগে রইলেম দুঃখের সমুদ্র শিয়রে!

উল্‌কা সম্পাত হলো। উল্‌কা সম্পাত হলো শুক্লাম্বরের বাড়িতে। পাগলিনী শচী এসে দাঁড়ালেন নিমাইয়ের মুখোমুখী। নীরব নিথর চতুর্দিক। সকলেই তাকিয়ে আছে শচীদেবীর পানে। নিমাই করলেন মায়ের উদ্দেশে প্রণাম। অমনি যেন ফেটে পড়লেন শচী অভিমানে দুঃখে। আর্তকণ্ঠে ডুকরে উঠলেন। বললেন, 'আর সন্ন্যাসে কাজ নেইরে নিমাই! চল, ঘরে ফিরে চল!'

প্রভু বললেন, 'আমিতো তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু করিনি মা! কেন কাঁদছ? আমাকে পুত্র বলে এখনও মিছে মায়া কেন মা?'

চিৎকার করে উঠলেন শচীদেবী—'না না না, ও কথা বলিস নে তুই! আমি যেন তোকে জন্মে জন্মে পুত্ররূপে পাই। বাপরে, এ মায়াপাশ কাটতে তুই আমাকে দিসনে। তোর মায়াই আমার সাধনা রে নিমু। তোর মায়াই আমার সাধনা!'

গৌরসুন্দর অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন মায়ের পানে। দেখেন তাঁর নয়নের নির-নির্ঝর। শোনেন তাঁর অন্তরের ক্রন্দন কীর্তন। ভক্তের ভগবান। তিনি কি কান্নায় সাড়া না দিয়ে পারেন? তাই তো বললেন

নিমাই, বললেন মায়ের পানে তাকিয়ে, 'জন্মস্থান দর্শন না করে আমি যাব না মা। কাল সকালে তোমার গৃহদ্বারে আবার আমাকে দেখতে পাবে!'

শচী সাধন-সফল হয়েছেন। এই তো ছিল তাঁর অন্তরের নিগূঢ় কামনা। জন্মস্থান দর্শনে গেলেই হতভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া একবার শেষ দেখা দেখতে পাবেন তাঁর প্রাণবল্লভকে। আহা তাঁর বড় দুঃখ! তাঁর যে কেউ নেই!

যাবার সময়ে শচীদেবী বললেন, 'আমি দ্বারপ্রান্তে সারারাত জেগে বসে থাকব বাপ। তুই যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যাস নে!'

শচী ফিরে এলেন ঘরে। নিয়ে এলেন এক পরম আনন্দের সংবাদ। নিমাই আসবে জন্মস্থান দর্শন করতে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার লাগে বিস্ময়। প্রভু আসবেন ঘরে। কেন? জন্মভূমি তো দর্শন করেছেন। দর্শন করেছেন মাকে। তবে কেন ঘরে আসছেন তিনি? যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। যেন মেনে নিতে পারছেন না শচীদেবীর কথা। ঠিক তখন এলেন কাঞ্চনা। বললেন, 'কি গো, হলো তো? আমি বলিনি সখি, তোকে না দেখে তোর প্রাণবল্লভ যেতে পারেন না।'

চাপা হাসি চুমু দেয় প্রিয়ার অধরে। সঙ্গে সঙ্গে মনের দিগন্তটায় জেগে ওঠে কতগুলো প্রশ্নের বিদ্যুৎ ঝলক। প্রভু না সন্ন্যাসী? তবে কেমন করে এসে দেখবেন স্ত্রীর মুখ?

বিশ্বভুবন যার নিয়মের দাস, তাঁর আবার নিয়ম কি? শুধু লোক হিতার্থে তাঁর নিষ্ঠার কাঠিন্য। শুধু জীবশিক্ষার জন্য তাঁর নির্বেদ বৈরাগ্য। কিন্তু যিনি স্বয়ং ভগবান—তাঁর কাছে নর নারীর ভেদ, গৃহী, সন্ন্যাসীর তারতম্য কিছু নেই তো। প্রেমের ঠাকুর যে ভক্তাধীন। ভক্তের আকুল আকুতিই তাঁর আহ্বানের মন্ত্র। ভক্তের চোখের জলই তাঁর আগমনের সরসী।

সারাটা রাত জেগে রইলেন প্রিয়া। রাতভোরে তিনি আসবেন। আসবেন প্রিয়ার প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর।

জনতার ভীড় ভেঙ্গে পড়েছে শচীর আঙ্গিনায়। প্রভুকে নিয়ে কীর্তন করতে করতে ভক্তবৃন্দ আসছে এগিয়ে। এগিয়ে আসছে প্রভুরই বাড়ির দিকে। জন্মস্থান দেখতে আসছেন প্রভু। শেষ দেখা। আর নবদ্বীপে

ফিরে গৌর কোনো দিন আসবেন না। পথের দুধারে তাঁর চিরপরিচিত বৃক্ষরাজি। কত স্নেহচ্ছায়া দিয়েছে তারা নিমাইকে। কত ব্যজন করেছে তাঁর ক্লান্ত তনুটিকে। একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাদের দেখে নিলেন নিমাইচাঁদ। ধীর মন্থর গতি। অগ্রসর হতে লাগলেন মাতঙ্গের মত। দেখছেন প্রতিটি দেব-মন্দির। দেখছেন প্রতিটি গৃহ। দেখছেন তাঁর আবাল্যের লীলাপীঠ নবদ্বীপের ধূলিবালিটি পর্যন্ত। সহসা থমকে দাঁড়ালেন এসে দরজার কাছে। কেন?

দ্বারের অন্তরাল থেকে এসে লুটিয়ে পড়ল, লুটিয়ে পড়ল একটি প্রসূন স্নিগ্ধ তনু। লুটিয়ে পড়ল প্রভুর চরণপ্রান্তে। পরণে মলিন বসন। রুক্ষ কেশ। নিরাভরণা। বিষণ্ণ বদন। জলভরা চোখ। কম্পিত দেহ। অশ্রু-ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। নিবেদন করছেন নীরবে প্রভুর দুটি রাঙ্গা পায়ে।

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে রবৌ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥

নারদকে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, থাকি না যোগীর হৃদয়ে। যেখানে আমার ভক্তের বসতি, আমার ঠাঁই যে সেখানেই।

আর ঐ ধূলাবলুণ্ঠিতা জ্যোতির্ময়ী গরীয়সীর পানে তাকিয়ে নিমাইচাঁদ বললেন, 'কে, কে তুমি, কি চাও কল্যাণী?'

থেমে গিয়েছে জনসমুদ্রের কীর্তন কণ্ঠ। বিস্ময়ের কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে সকলের চোখ। এত বড় দুঃসাহসের কাজ শ্রীমতী করতে পারলেন? শত শতাব্দীর বেদন-করুণ-কাহিনীর অলিখিত অধ্যায়ের এ যেন একটি মীড় মূর্চ্ছনা! ধীরে অতি ধীরে মাথা তুলে চাইলেন শ্রীমতী। সপ্ত সমুদ্রের ঢল নেমেছে নয়নে। হাজারো রাত্রির বিষণ্ণতা এসে ভেঙ্গে পড়েছে বদন কমলে। তাপদগ্ধ হৃদয়ের গহন অতল থেকে প্রস্ফুরিত হলো আজন্মের প্রত্যয় দৃঢ় উক্তি 'তোমার দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া।'

পাষাণ-ফলকে যেন এ এক শাণিত স্বাক্ষর।

এক পা নড়াতে পারলেন না প্রভু। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বললেন তার পরে, বললেন আড়ষ্ট কণ্ঠে, 'কি প্রার্থনা তোমার?'

'প্রভু!'

কেঁপে ওঠে প্রিয়ার কণ্ঠ। টপ টপ করে ঝরে পড়ে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু। দিবসের কল-কোলাহল গিয়েছে বন্ধ হয়ে। স্তব্ধ শান্ত চতুর্দিক। প্রকৃতির বুকেও লেগেছে প্রিয়ার প্রাণবেদনার ছোঁয়া। পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। বইছে না হাওয়ার নিঃস্বন।

বললেন বিষ্ণুপ্রিয়া, 'জগৎ-জীব উদ্ধার হয়ে গেল ও দুটি রাঙ্গা চরণের ছোঁয়া পেয়ে। কেবল কি বিষ্ণুপ্রিয়াই থাকবে চির-বঞ্চিতা ?'

আনত মস্তকে কি যেন ভাবলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া, এবারে তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হও। তোমার নাম সার্থক করো।'

রোদনে উচ্ছ্বাসে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, 'তুমি বৈ তো আমায় দ্বিতীয় কৃষ্ণ নেই প্রভু! আমার কৃষ্ণ বিষ্ণু সবই যে তুমি।' তুমি ছাড়া আমার ঘরে বাইরে যে কোথাও কিছু নেই! একথা কি নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে আজ!

প্রভুর অন্তর ভক্তের আকুল আর্তিতে যেন গলে যাচ্ছে। ভক্তের অশ্রু দেখে বুঝি প্রভুও গিয়েছেন বিচলিত হয়ে। তাই ধীর কণ্ঠে বললেন, 'হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, তোমাকে দেবার মতো আমার আর তো কিছু নেই!'

—কিছু নেই ?

ধীরে ধীরে প্রভু পা দুটি তুলে নিলেন খড়ম থেকে। বললেন বিষ্ণু-প্রিয়াকে 'আমার এই খড়ম নিয়ে গিয়ে পূজো কর। মনে শান্তি পাবে।'

সাগ্রহে বিষ্ণুপ্রিয়া খড়ম তুলে নিলেন মাথায়। প্রভুকে প্রণাম করলেন। দুই গণ্ড বেয়ে নামল কান্নার অশ্রু। ভক্তবৃন্দ এবারে উঠল মুখর হয়ে। প্রাণের আনন্দে তারা বলে উঠল 'জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।'

প্রিয়া চলে গেলেন অন্দরে। খড়ম মাথা থেকে আনলেন বক্ষে। চুমু খেতে লাগলেন বারে বারে। চুমু খেতে লাগলেন প্রভুর দেয়া কাঠ পাদুকায়।

এই তো তাঁর আজীবনের সঙ্গী! সারা জীবনের সম্বল।

নবদ্বীপের আকাশ থেকে গোরাচাঁদ বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন চিরদিনের মত।

॥ পঁচিশ ॥

এবারে আমাকে নিয়ে যাও।

নিয়ে যাও সীমান্বিত পৃথিবী থেকে অসীমে। মুক্তি দাও সঙ্কীর্ণ অন্ধকারের গুহা গহ্বর থেকে। নিয়ে চলো নীহারিকার মহা-অঙ্গনে। আলো চাই। শুধু আলো। আর রেখোনা এ নিঃসীম অন্ধকারে। এবারে জ্যোতিষ্ক লোকের পথে হোক যাত্রার সূচনা। থেমে যাক কান্নার কণ্ঠ। আর যে কাঁদতে পারি নে। পারিনে এ তুঃসহ অন্ধকারের নির্মম পীড়ন সইতে। হে নাথ, তোমার হোম বহ্নির কিরণ সম্পাত হোক আমার অন্তর-মন্দিরে। আমি নীরবে বসে থাকব। বসে থাকবো তোমারই মুখ পানে চেয়ে। যাত্রা করব সান্ত থেকে অনন্তে।

শরীর ভেঙ্গেছে শচীদেবীর। এসেছে নির্জীব স্থিরতা। শুয়েই থাকেন। নেই উত্থান-শক্তি। জীর্ণক্লান্ত দেহ। একটি মুহূর্তের জন্যও যেন পান না এক বিন্দু শান্তি। সব সময়ই কি যেন খোঁজেন। কাকে যেন ডাকেন। মাঝে মাঝে ফেলেন দীর্ঘশ্বাস। চোখের পার গড়িয়ে নামে নীরব অশ্রু।

ওরা তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে ভক্তবৃন্দ অপলক নয়নে। ঈশান ফেলে দীর্ঘশ্বাস। চোখের জল মোছেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

কণ্ঠে কথা নেই। বাকশক্তি নিয়েছে বিদায়। তবুও তার মাঝে রুদ্ধ হৃদয়ের আবেগ-মন্থনে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে শচীদেবীর কণ্ঠ থেকে—আমার নিমাই এখনও এলোনা? ও বুঝি আর আসবে না!

থর থর করে কেঁপে ওঠে অধর সম্পুট। সকলের বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে হতাশার বেদন-বাণী—হায়! হায়!

বিষ্ণুপ্রিয়ার নেই উৎকণ্ঠার অন্ত। নেই বিন্দু বিশ্রাম। দিবস যামিনী বসে থাকেন। বসে থাকেন অতন্দ্রিত প্রহরীর মত শাশুড়ীর শিয়রে। শঙ্কায় কাঁপে বুক। করে দুরু দুরু। অবস্থা যেন দিন দিনই যাচ্ছে ঘোরাল হয়ে। নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছেন শচীদেবী। ডুব দিতে চাইছেন যেন কোন

অতল গভীরে। এ কি নিশ্চিত নিক্রান্তির প্রাক্ পর্ব নয়? নয় কি এ মহাযাত্রার মহা আয়োজন?

বুঝি বা তাই। দহন দীর্ণ জীবনের জালা জুড়াতে চাইছেন শচী। জালা জুড়াতে চাইছেন মরণকে বরণ করে। কি হবে আর এ মরুদগ্ধ জীবনের ভার বহন করে। তাই তো শচী চলেছেন, চলেছেন দুঃখাগ্নির আগ্নেয়গিরি থেকে পরা প্রশান্তির পরম প্রকাশে।

প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান। সেবারত। প্রাণ ঢেলে সেবা করছে মাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু তার দেহও হয়েছে জীর্ণ। ক্লান্তি এসে নিয়েছে আশ্রয়। তবুও থামেনি ঈশান। নেয়নি ছুটি। প্রভুর কাজে এতটুকু শৈথিল্য নেই তার। নেই বিন্দু বিশ্রান্তি।

সঙ্গে এসে যোগ দিল বংশীবদন। পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রভু তাকে। পাঠিয়ে দিয়েছেন নদীয়ায় মা ও ঘরণীর সেবা করতে।

নদীয়ার নরনারী দল বেধে আসে। আসে শচীদেবীকে দেখতে। সকলের মুখেই এক বাক্য। এক কথা। সকলের চোখেই জল শুধু জল। ওরা তাকাতে পারে না। দীর্ণ হয়ে যায় বক্ষ। প্রাণের কান্নার সঙ্গে অস্ফুটে ধ্বনিত হয়—নেই, এবারে আর আশা নেই।

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বিষ্ণুপ্রিয়ার। শূন্যবক্ষ ভরে যায় বেদনার আতপ্ত নিঃশ্বাসে। ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে দেহ। কাঁপে থর থর করে। মনের ক্রান্তিবৃত্তে এসে আছড়ে পড়ে খ্যাপা গঙ্গার ঢেউ। তার মাঝ থেকে উঁকি মারে একটি প্রশ্ন—সত্যই তুমি চলে যাচ্ছ?

যদি তাই সত্য হয়, তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকবেন প্রিয়া? কে মুছিয়ে দেবে তাঁরা চোখের জল। কে শোনাবে আশার মন্ত্র। কে পরাবে পট্টবাস। কেই বা অঙ্গের ধূলা ঝেড়ে টেনে নেবে স্নেহের অঙ্কে? জীবনের সুরু থেকে সমাপ্তির মগ্ন লগ্নটি পর্যন্ত যার সঙ্গে ছিল একটা বিচ্ছেদহীন সম্বন্ধ, তাঁর বিদায় মুহূর্তটিকে কেমন করে গ্রহণ করবেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ওঁর কি আর কেউ আছে?

হতাশার অঙ্কে প্রিয়া কাঁপেন শঙ্কায়। বলেন কাঞ্চনাকে—ওরে কাঞ্চন, তুই আমার কাছ ছাড়া হোস নে। আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছেনা।

কাঞ্চনা থাকেন প্রিয়ার কাছে কাছেই। করেন শচীদেবীর সেবা যত্ন। কখনও বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অশান্ত ভগ্ন মনকে করেন শান্ত। দেন সান্ত্বনা। এমনি ধারা কাটে রাতের পর রাত। দিনের সূর্য কখন্ ওঠে, কখন্ যায় ডুবে—খেয়াল থাকেনা বিষ্ণুপ্রিয়ার। কোনো দিন বা দুমুঠো অন্ন মুখে দেন। কোনো দিন তাও আর হয়ে ওঠেনা।

কাল সারটা রাতই ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া জেগে বসে। বসে ছিলেন শচীদেবীর শিয়রে। কেন? খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে তাঁর অবস্থা। আর আশা নেই। সব আলো নিভে এসেছে। পরিশোধ করা হয়ে গেছে শচীদেবীর আয়ুর ঋণ। কেটেছে মায়ার বাঁধন। আসক্তির অঙ্ক থেকে নিয়েছেন বিদায়। বিদায় নিয়েছেন মায়াময় ছায়াঘেড়া এই পৃথিবীর কোল থেকে। আর কেন? এবারে ডাকো, ডাকো গৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদদের। ওরা নিয়ে যাক। নিয়ে যাক সুরধুনীর তীর-তর্থে। নিয়ে যাক মৃত্যু থেকে অমৃতের মহাপথে।

রাত ভোর হোল। এলো ভক্তবৃন্দ। এলো গৌর-মন্দিরে। সুরু হলো নাম সঙ্কীর্তন। আকুলকরা কণ্ঠ। ব্যাকুলতায় ভরা। ডাকতে লাগল গৌরসুন্দরকে। সঙ্গে চলল কৃষ্ণ-কীর্তন। হরিনামের রস-বন্যায় নদীয়া হলো আপ্লুত। 'জয় শচীমাতা' বলে ধ্বনি দিতে লাগল তারা বারে বারে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখনো বসে আছেন শাশুড়ীর অন্তিম শিয়রে। মুখে নেই কথা। নেই তাঁর চোখে পলক। শুধু আছে চোখ ভরা জল। আর বুক ভরা ব্যথা। আজ আর পারেননি প্রিয়া, পারেননি তাঁর অবাধ্য অশ্রু-ধারাকে রোধ করতে।

কেমন করেই বা পারবেন? আজ যে তাঁর স্মৃতির দুয়ার গিয়াছে ভেঙ্গে। নেপথ্যে এসে উঁকি মেরেছে বেদনা-স্নাত অধ্যয়গুলোর রোদন-ক্লান্ত পরিচ্ছেদ। তাই উঠেছে উদ্‌বেল হয়ে, উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে তাঁর কান্নার সমুদ্র।

পালঙ্ক নিয়ে এলো ভক্তবৃন্দ। সাজাল ফুল সাজে। মুমূর্ষু শচীদেবী।

ধরাধরি করে তুলল তাঁকে শয্যায়। চোখের জলে ধুয়ে দিল জননীর চরণ যুগল। রাখল শেষ প্রণতি। তুলে নিল জননীর দিব্যযান। তুলে নিল স্কন্ধে। নদীয়ার পথ করল পরিক্রমণ। শেষবারের মত শচীদেবী দেখে নিলেন, দে:খ নিলেন তাঁর গৌরসুন্দরের লীলাতীর্থ। চলে এলেন সুরধুনীর তীরে।

এই তো মহাপ্রস্থানের পথ। এই ঘাটেই বাঁধা আছে শান্তি পারাবারের তরণী। কতদিন শচীদেবী এসেছেন এ ঘাটে। করেছেন স্নান। জানিয়েছেন মহামিলনের প্রার্থনা। কিন্তু লগন না এলে তো ধ্বনিত হয়না আহ্বান সঙ্গীত। আজ সমাগত হয়েছে শুভ লগন। যাত্রা করেছেন শচীদেবী। যাত্রা করেছেন তাই তো তাঁর পরম জনের কাছে।

কীর্তন ক্রমে বেড়ে চলল। শচীদেবী ডাকলেন, ডাকলেন ইঙ্গিতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ধরলেন জড়িয়ে তাঁর গলা। কি যেন বললেন অস্ফুটে। কেউ তা শুনল না। শুধু দেখল, দেখল শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্তিমিত নয়ন। আর সময় নেই। ডাক এসেছে। চোখ দুটো শচীদেবীর গেল বড় হয়ে। ভক্তবৃন্দ কাতরকণ্ঠে কেঁদে উঠলো। ডাকল কান্নার কণ্ঠে গৌর-সুন্দরকে—হে নাথ, হে গৌরাঙ্গ, এসো, শুধু একবার এসে দেখে যাও তোমার জননীকে। দেখা দাও শেষ বারের মত!

চোখের জলে ভক্তবৃন্দের নয়ন ভাসছে। মা, মাগো বলে তারা ডুকরে কাঁদতে লাগল। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদলেন নীরবে। থরথর করে কেঁপে ওঠে অধর যুগল। কাঞ্চনা বসে আছেন। বসে আছেন তাঁর প্রিয় সখিকে ধরে। প্রভু এলেন। দিলেন শেষ দেখা জননীকে।

সহসা কি হলো। বয়ে গেল সাঁ সাঁ করে একটা দমকা হাওয়া। কি যেন বলতে চাইলেন শচীদেবী। কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস। মাথাটি গড়িয়ে পড়ল বালিশ থেকে। শেষ হয়ে গেল সব। বিষ্ণুপ্রিয়া জড়িমা-জড়িত কণ্ঠে একবার শুধু বললেন—মা, মাগো!

আর কোনো কথা নয়। হারিয়ে গেল তাঁর জ্ঞান। পড়লেন মূর্চ্ছিত হয়ে। কাঞ্চনা জাপটে ধরলেন। জাপটে ধরলেন তাঁর প্রিয় সখিকে আবক্ষ আলিঙ্গনে। প্রভুকে দেখেই প্রিয়া হারিয়ে ফেলেছেন বাহ্যজ্ঞান।

হয়েছেন মূর্চ্ছিতা। কিন্তু মূর্চ্ছা তো আর ভাঙ্গে না! বহু কষ্টে কাঞ্চনা ফিরিয়ে আনলেন জ্ঞান। ধরে নিয়ে এলেন বাড়িতে।

শচীদেবী চলে গেলেন। চলে গেলেন দুঃখজর্জর দিনের দুয়ার আজন্মের মত রুদ্ধ করে। চলে গেলেন সীমা থেকে অসীমে। অনিত্য থেকে নিত্যধামে।

সব আবরণ ক্ষয়ে গেল। ঘুচল সকল পরাজয়। চুপে চুপে এলো মরণ। নিয়ে গেল শচীদেবীকে পরম প্রকাশে।

॥ ছাব্বিশ ॥

ওরে মন, আর ভিড়ে নয়, নিয়ে চল নিবিড়ে।

কতকাল সন্ধান সাধনায় কাটবে! আর কতকাল থাকব বসে! এবারে সন্ধি হোক। আমাকে বলতে দাও—এই লভিনু সঙ্গ তব, এই লভিনু সঙ্গ!

সব তো নিয়ে নিলে। আমার বলতে কি রইল? কিছুনা। কেবল তুমি আছ। তুমি আছ বলেই আমার স্থিতি। আমার প্রীতি। তোমাকে কাছে না পাই, মনে তো পাব। মনের দুয়ারে বসলেম। তুমি এসো আমার মানস-সরোবরে। সুখে না থাকো, দুঃখে তো আছ। তুমি কৃপাময় বলেই এবারে হয়েছি কৃপার পাত্রী। তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর বলেই হয়েছি ভিখারিণী। ধরেছি দীন বেশ। নিয়েছি কঠোর ব্রত।

এত বড় পৃথিবীতে বিষ্ণুপ্রিয়া আজ একা। শূন্য ঘর। শূন্য মন। শূন্য হয়ে গিয়ে আদিগন্ত। কেউ নেই। কিছু নেই। আছে শুধু চোখের জল। আর বুকের ব্যথা। সম্বল শুধু এই তো।

এই কান্না দিয়েই ডাকব এবারে কৃপাকঠোরকে। বেদনার উপাচারে করব তার অর্চনা। এ বুকের দহন তো তারই দেয়া ধন। এ কান্নার মন্ত্র তো তারই।

ভোর হয়। পূর্ব দিগন্তে পড়ে আলোর লেখা। ডাকে পাখী। কর্মব্যস্ত মানুষেরা নামে পথে। কোথাও নেই নিয়মের ব্যতিক্রম। সব

ছিমছাম। সব গুজগাজ। কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্জগতের নেই কোনো ছেদ, সমাপ্তি, নিয়ম। ওখানে যেন প্রলয় প্রহেলিকার প্রারব্ধ যৌবন।

প্রত্যূষে শয্যা ছেড়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া। করেন স্নান সমাপন। ঢোকেন মন্দিরে। জানু ভেঙ্গে বসেন প্রভুর কাষ্ঠ পাদুকার সম্মুখে। জড়িয়ে ধরেন বুকে। কাঁদেন অঝোরে। হে নাথ, তুমি না বলেছ— আমি না কাঁদলে জীব কাঁদবে না?

আজ তোমার দেয়া মন্ত্রকেই করে নিয়েছি জীবনের ধ্রুব।

আত্মমগ্ন হয়ে যান বিষ্ণুপ্রিয়া। আত্মমগ্ন হয়ে যান কান্নার সাধনায়। কেটে যায় কত প্রহর। কত রাত্রি। সেদিকে নেই তাঁর খেয়াল। গৌরভজনের একনিষ্ঠ সাধিকা ব্রহ্মচারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়োজিত করলেন সর্বশক্তি। নিয়োজিত করলেন গৌরাঙ্গ-আরাধনায়। বসলেন কৃচ্ছ্রব্রতের আসনে।

রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে প্রিয়াজীর ঘরের দরজা। কারো নেই সেখানে যাবার অধিকার। দেবীর দর্শন পাওয়াই এখন দুঃসাধ্য। কিন্তু ভালো লাগেনা বংশীবদনের। ভালো লাগেনা প্রিয়াজীর এ দুঃসহ তপ তিতিক্ষা। এমন ধারা চললে যে জীবন থাকবেনা। বিদায় নেবে দেহ দেউলের প্রহরী। জীর্ণ হবে সোনার অঙ্গ। মরণ এসে বরণ করে নেবে আদরে।

কে শোনে সে কথা। নামবন্যার খর প্রবাহ চলেছে। চলেছে প্রিয়াজীর হৃদ-কালিন্দীতে। নামের হ্লাসে চোখ ভরে আসে জল। কণ্ঠে ক্ষরিত হয় সোমসুধা। ক্ষুধা তৃষ্ণা যান ভুলে। পড়ে থাকেন নামকে করে আশ্রয়।

‘নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।’

হে করুণাঘন, হে জীবনবল্লভ, তুমি বৈ আমার কে আছে? আমি কেঁদে কেঁদে দেব তোমার চলার পথের আবিল ধুয়ে। তুমি অশ্রুসিক্ত পথে করো পদসঞ্চার। এসো আমার হৃদমন্দিরে!

এ যে দুঃসহ ব্রত · দুর্বার গতি।

স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে বসেন প্রিয়াজী। বসেন সম্মুখে একটি পাত্র নিয়ে। ওতে কি আছে? চাল। রাখেন আর একটি শূন্য পাত্র।

রাখেন কাছেই। শুরু হয় জপ। জপ শুরু করেন বিষ্ণুপ্রিয়া সম্মুখে রেখে ক্ষুন্নিবৃত্তির সামগ্রী। চিত্ত মগন হয়ে যায় নামসুধায়। তন্ময় বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রাণের কান্নায় অভিষিক্ত করেন একটি তণ্ডুল। জপ করেন একবার নাম। রাখেন শূন্য পাত্রে। ফেলেন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস। চোখ থেকে ঝরে পড়ে, ঝরে পড়ে কয়েক ফোটা জল।

এক নাম, এক তণ্ডুল।

ভুল নেই হিসেবে। নিখুঁত ভাবে সংখ্যা রেখে চলেছেন। নামের সংখ্যা। দুপুরের প্রচণ্ড সূর্যটা করে খাঁ খাঁ। দিনের দেহে আসে ক্লান্তির কান্না। অতীত হয়ে যায় তিনটি প্রহর।

আর কত সময় থাকবে বসে? এখন ওঠো। দানা পানি না পেটে পড়লে সাধন মননও যে যাবে বন্ধ হয়ে। দেহধর্মকে উপেক্ষা করতে আছে কি?

জপ শেষ হলো। তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকালেন বাহির পানে। বেলা যে পড়ে এলো। যেন সেদিকে নেই কোন খেয়াল। কি করে থাকবে? বিষ্ণুপ্রিয়া যে ডুবে গিয়েছিলেন নামের মধুরে। ডুবে গিয়েছিলেন এক অপার্থিব আনন্দের সুধা সায়রে।

তাকালেন এবারে শূন্য পাত্রটির পানে। জমেছে কয়েক মুষ্টি চাল। দাঁড়ালেন উঠে। নিলেন পাত্রটি হাতে। আনলেন ধুয়ে। একটা কাপড় টেনে নিলেন। বাঁধলেন মুখে। কেন?

> 'জপান্তে সে সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
> যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥'

এ অন্নের উপকরণ কি?

ন্যাস, প্রণায়াম আর কুম্ভক।

শুধু কি তাই?

না, আরও আছে।

কি?

আর্তি, প্রীতি, অশ্রু ও নাম।

সপ্ত উপকরণে বিষ্ণুপ্রিয়া ভোগ লাগালেন। ভোগ লাগালেন

সপ্ত-লোকাধিপতিকে। রুদ্ধ করে দিলেন দুয়ার। কেটে গেল কিছুটা সময়। দরজা খুললেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপর?

'বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষ প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥'

দিনান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রহণ করলেন নাম-সিদ্ধ-অন্ন। বাকীটা দিলেন বিলিয়ে। বিলিয়ে দিলেন ভক্তদের মধ্যে। ধন্য হলো ভক্তবৃন্দ। ধন্য হলো মহাপ্রসাদের অমৃত-আস্বাদনে।

সংবাদটি ক্রমে পড়ল ছড়িয়ে। ছড়িয়ে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বিধুর অন্তরের কঠোর তপের সংবাদ। সারাটা নদীয়ার লোক ফেলল চোখের জল। বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনায় তারা কাঁদল। মুছল নীরবে চোখের তপ্ত অশ্রু। ফেলল দীর্ঘশ্বাস। করল—হায়, হায়!

শুধু নদীয়ায় কেন? নীলাচলেও পৌঁছল এসে এ দুঃসহ মর্মদীর্ণ সংবাদ। প্রভু হলেন চিন্তিত। হলেন দুঃখীত ও মর্মাহত। গৌরাঙ্গের বক্ষবিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আজ যোগিনী। সন্ন্যাসিনী। রাণী হয়েছেন কাঙ্গালিনী। হয়েছেন ভিখারিণী।

গৌরবিরহের এমনি ধারা। এ প্রেম হৃদয়কে করে নির্মল। পরিয়ে দেয় গৈরিক বাস। মনকে করে বৃন্দাবন। নিয়ে যায় ঐশ্বর্য থেকে মাধুর্যে। কানে দেয় কান্নার দীক্ষা।

কিন্তু প্রভুর যেন অন্যভাব। বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোর তপ তাঁকে নিয়ে এলো মগ্নতার পথে। কৃষ্ণবিরহের কান্নায় অশান্ত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণচৈতন্য। গেলেন পাগল হয়ে. খেয়াল নেই। নেই নিদ্রা। দিন যায়। রাত আসে। প্রভু হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে ধেয়ে যান কালিন্দীর কূলে। মেঘ জমে আকাশে। তার পানে তাকিয়ে হয়ে পড়েন অধীর। তমাল তরুর নীচে দিয়ে পারেন না হাটতে। যেন শোনেন কালার বাঁশরী বাজে। জড়িয়ে ধরেন গাছের গুড়িটা আবক্ষ আলিঙ্গনের মধ্যে। ভক্তবৃন্দ হয়ে পড়লেন চিন্তিত। প্রভুকে যে এখন ঘরে রাখাই হয়ে উঠল দায়।

সব সংবাদ এসে পৌঁছায় বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে। ব্যথা পান তিনি। কৃচ্ছ্রতার চরমতম শিখরে করেন আরোহণ। ডাকেন পরমজনকে। বলেছিলেন একদিন প্রিয়া। বলেছিলেন তাঁর প্রাণবল্লভকে, 'প্রভু, তুমি যে সব নিয়ম পালন করবে, তার চেয়েও কঠোর নিয়ম দেবে এই 'দাসীকে।'

'আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥'

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া আজ সেই কঠোরেই বেঁধেছেন তাঁর কোমল প্রাণ। হয়েছেন ব্রতময়ী। জীবের কলুষ-মলিন মনকে করবেন উজ্জীবিত। উজ্জীবিত করবেন প্রভাতের কারুণ্য বর্ষণে। নিজে কেঁদে কাঁদাবেন জীবকে।

গৌরসুন্দরের লীলা এলো শেষ হয়ে। তাঁর প্রাণপ্রিয় বিষ্ণুপ্রিয়া আজ সন্ন্যাসিনী। আর ভাবনা নেই। সমুদ্রের উদ্‌বেল উচ্ছ্বাসের মত যাচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া এগিয়ে। এগিয়ে যাচ্ছেন জীবমুক্তির মহা মোহনায়। প্রভু এখন মুক্ত। শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর কাজ। সাধন সমরে হয়েছেন জয়ী বিষ্ণুপ্রিয়া। কান্নার মন্ত্র জপে লাভ করেছেন সিদ্ধি। নিয়েছেন মাথা পেতে, মাথা পেতে নিয়েছেন স্বেচ্ছায় প্রভুর সকল কর্মভার।

তবে আর কেন? আর একটু কাঁদো। কাঁদো আতুর অশ্রু নিবেদন করে। জ্বালিয়ে দাও জীব-অন্তরে বেদনার হোম-হুতাশন। নামাসক্তির অনল দহনে নেমে আসুক জীব-জীবনে কান্নার ঝর্ণা। তারাও কাঁদুক। কাঁদুক ভগবানের জন্য।

তাই হলো। প্রভু বিদায় নিলেন। বিদায় নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে চরমতম আঘাত হেনে। নেমে এলো দারুণ দুঃখের ঢল। 'হা গৌর! হা গৌর!' বলে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগল সারাটা নবদ্বীপ। বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্তটা দেহপ্রাণ অনুলিপ্ত হয়ে গেল বেদনার ম্লানিমায়। আর কিছু নেই। কেউ নেই। সব শেষ হয়ে গেল। চলল এবারে পূর্ণাহুতির মহাযজ্ঞ।

ঈশানও নিয়েছে বিদায়। প্রভুর অপ্রকট সংবাদে বংশীবাদন পড়েছে ভেঙ্গে। দিনরাত শুধু কাঁদে। কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখে। আহার নিদ্রা নিয়েছে বিদায়। দেবীর দুঃখে বংশীও ছেড়ে দিয়েছে সব-কিছু।

'বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্বক্ষণে॥
দুইজনে অন্ন-পান করিয়া বর্জন।
হা নাথ গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্বক্ষণ॥'

হে প্রভু! তোমার মনে এই ছিল? আমাকে রেখে গেলে কার কাছে! কি লয়ে থাকি। কি দিয়ে দূর করি জীবনের এ সন্তাপ! ওগো, আর নয়। আর রেখোনা আমাকে এ দুঃখ-জর্জর দিনের আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে। আর পারিনা যে! কাছে টানো। দাসীকে ঠাঁই দাও তোমার চরণে!

রাত গভীর। বংশীবদন ঘুমিয়ে পড়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন-মন্দিরে পড়ে আছেন আধঘুমে তন্দ্রায়িত হয়ে। এমনি সময় এলেন প্রভু। এলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। বললেন, 'আমার জন্যে তোমরা কেঁদোনা। শোন, যে নিম গাছের নীচে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, আর যে নিম গাছের স্নেহচ্ছায়ায় বসে মা আমাকে স্তনপান করাতেন—সে বৃক্ষ দ্বারা নির্মাণ করো আমার দারু মূর্তি। প্রতিষ্ঠা কর নবদ্বীপধামে। তার সেবা কর। সেই দারুমূর্তির মধ্যেই তোমরা পাবে আমাকে।'

স্বপ্ন টুটে গেল। চমকে উঠলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ডাকলেন বংশীকে—ওরে বংশী, এমন দেখলাম।

বংশীও দেখেছে। বংশীও পেয়েছে প্রভুর আজ্ঞা। নির্মিত হলো প্রভুর দারুমূর্তি নবদ্বীপধামে। ধার্য হলো শুভদিন। ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান জানাল বংশী। গৌর ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলো নদীয়ায়। উদ্‌যাপিত হলো মহা সমারোহে উৎসব।

শ্রীপাদ যাদব মিশ্রের পুত্রকে নিয়োজিত করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। নিয়োজিত করলেন মন্দিরে নিত্য সেবা-পূজার জন্য। সব কাজ ফেলে রেখে যাদব ও তাঁর ছেলে গৌর-ভজনায় মন দিলেন।

এদিকে বংশীর দিন এলো ফুরিয়ে। সে বিদায় নিল। গৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস বংশীবদন প্রিয়াজীর চরণতলে চিরশান্তির ঘুমে মগ্ন হলেন।

শচীদেবী চলে গেলেন। প্রভু হলেন অপ্রকট। ছিল বংশী আর ঈশান। তারাও তো চলে গেল। তবে আর কেন? এবারে দেহ-ত্বয়ার ভেঙ্গে মন তুই মহামনে মিলিয়ে যা। ও দিকে শচীদেবীর বিদায়ের পরেই সনাতন মিশ্র ও মহামায়া দেবী নিয়েছেন বিদায়। সব হারিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বসে আছেন একা। একটা দুস্তর দুঃখের পারাবারের পারে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছেন তিনি তাঁর প্রভুকে। ডাকছেন এ ভব-খেয়ার মাঝিকে।

বৃদ্ধ শুক্লাম্বর আছেন এখনও বেঁচে। বেঁচে আছেন কাঞ্চনা ও অমিতা। তাঁরা করেন দেবীর দেখা শোনা। করেন সেবা যত্ন।

আজ গৌর পূর্ণিমা। প্রভুর জন্মদিন। সারাটা দিনই একরকম শুয়ে ছিলেন প্রিয়াজী। উঠে বসলেন শেষ বেলায়। নবদ্বীপে আজ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে প্রাণগৌরাঙ্গের বিচ্ছেদ-বিলাপ। সকলের চোখে মুখেই নীরব বেদনার বিধুর ক্রন্দন।

সন্ধ্যা নামে। গোঠের গাভী ফেরে ঘর পানে। শ্রান্ত পাখীর পক্ষ বিধুনন ভেসে আসে কানে। ভেসে আসে সুরধুনীর কান্নাভরা উচ্ছ্বাস। প্রশান্ত নবদ্বীপ। সর্বত্র বিরাজ করছে একটা হেম-নিবিড় গাম্ভীর্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘর থেকে নামলেন বাইরে। সঙ্গে কাঞ্চনা। যাচ্ছেন প্রিয়াজী প্রভুর দারুমূর্তি দর্শন করতে মন্দিরে। ধীর পদপাত। এ লীলা-ভূমির মায়া কাটাতে মন যেন আদৌ সায় দিতে চাইছে না। তবুও যেতে হবে। যেতে হবে প্রভুর ইঙ্গিত পেলেই।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন মন্দিরের সম্মুখে। তাকালেন দুটি কাতর-করুণ নয়নে দারুমূর্তির পানে। চোখভরা অশ্রু। বুকভরা বেদনা। অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়তে লাগল টপ টপ করে জল।

কাঞ্চনা সবই দেখছেন। দেখছেন তাঁর প্রিয় সখীর বিরহ-তাপিত হৃদয়ের অশ্রু-অর্ঘ্য। শুধু কান্নায়ই নিবৃত্তি নয়—আজ যেন বিষ্ণুপ্রিয়া দৃঢ়বদ্ধ হয়েই এসেছেন। যে করেই হোক প্রভুর কৃপা বৈ তিনি যাবেন না।

স্থানুর মত দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। নীরবে নিবেদন করতে লাগলেন অন্তরের অনন্ত তৃষা মৌন প্রার্থনা। নিবেদন করতে লাগলেন প্রভুর সমীপে।

মন্দিরে তখন শুরু হয়েছে আরতি। বেজে উঠেছে শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ ও করতাল। ধূপ দীপে চতুর্দিক হয়েছে পুলক-মদির।

সহসা চমকে ওঠেন কাঞ্চনা। বিস্ফারিত হয়ে যায় তাঁর আঁখি দুটি। নিথর হয়ে আসে দেহ। শুকিয়ে যায় কণ্ঠ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কে গেল।

কেন?

তিনি দেখলেন, দেখলেন দারুমূর্তির অমিয় অধরে হাসির জ্যোছনা। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্ঠ, 'কাঞ্চনমালা! একবার যাদবের কাছে যা শীগগির!'

'কেন?'

'তাকে বল গে, আমি একবার মন্দিরে যাব।'

কাঞ্চনমালার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অবাধ্য অশ্রুর ধারা। কাঞ্চন আচলে চোখ মুছে তাকালেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পানে। বললেন আবার প্রিয়াজী, 'আরতির পরেই যেন আমাকে ডাকে। আমি মন্দিরে ঢুকলে যাদব যেন বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।'

কোনো কথা এল না কাঞ্চনার মুখে। নীরবে তিনি চলে গেলেন। চলে গেলেন প্রিয়াজীর ভ্রাতা যাদবাচার্যের কাছে।

ক্রমে সাঙ্গ হয়ে এলো আরতি। যাদব ডাকলেন তাঁর দিদিকে। বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে করলেন প্রণাম। ঢুকলেন অভ্যন্তরে। দরজাটি দিলেন যাদব বন্ধ করে।

ভক্ত বৃন্দের কীর্তন-কণ্ঠ তখন উঠল গান্ধার থেকে ধৈবতে। আজ আর শুধু গৌরাঙ্গ নয়—তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া'র মহা মন্ত্র।

বেশ কিছুটা সময় হলো অতিক্রান্ত। খুলে ফেললেন যাদব মন্দিরের দরজা। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কোথায়? নেই তিনি মন্দিরে। খুঁজলেন সকলে। কিন্তু পেলেন না তাঁর সন্ধান।

তবে ?

চিরবিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহদগ্ধ প্রাণ পেয়েছে প্রশান্তির অমিয় অঙ্ক। গৌর-গর্বে গরবিনী হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। হলেন তাঁর বক্ষবিলাসিনী—প্রভুর বিলাস-মূর্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বর্ণ-তনু গেল মিলিয়ে, গিলিয়ে গেল গৌর-সোনার দারু অঙ্গে।

হাহাকার করে উঠল সকলে। কাঞ্চন লুটিয়ে পড়লেন ধূলিতে। ভক্তবৃন্দ কাঁদলেন হাক ছেড়ে। যাদব আর্ত কণ্ঠে ডাকলেন—দিদি! দিদি!

সব শেষ হয়ে গিয়েছে! দুঃখশ্রান্ত বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রয় নিয়েছেন, আশ্রয় নিয়েছেন চিরশান্তির, চিরকান্তির অঙ্কে। নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে তাঁর দহন জ্বালা। আর ও-রূপ কেউ দেখবে না! আর ও-চোখের জল ঝরবে না!

হে পাঠক! দু'ফোটা অশ্রুনির্ঝরে ধুয়ে দাও চিরবিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণযুগল। সফল করে তোল তাঁর কান্নার সাধনাকে।

জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই পুস্তক রচনায় সাধারণতঃ যে সকল গ্রন্থের অল্পবিস্তর সাহায্য নিয়েছি :—

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর
৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস
৪। মুরারি গুপ্তের করচা
৫। গোবিন্দ দাসের করচা
৬। বৈষ্ণব পদাবলী
৭। অমিয় নিমাই চরিত—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ
৮। বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত—হরিদাস গোস্বামী
৯। গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
১০। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া (পত্রিকা) নবদ্বীপ ধাম
১১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
১২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—বিধুভূষণ সরকার
১৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান—বিজনবিহারী মজুমদার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।